এইচ জি ওয়েলস

টাইম মেশিন

রূপান্তরঃ খসরু চৌধুরী

সবা প্রকাশনী
শ্যামল

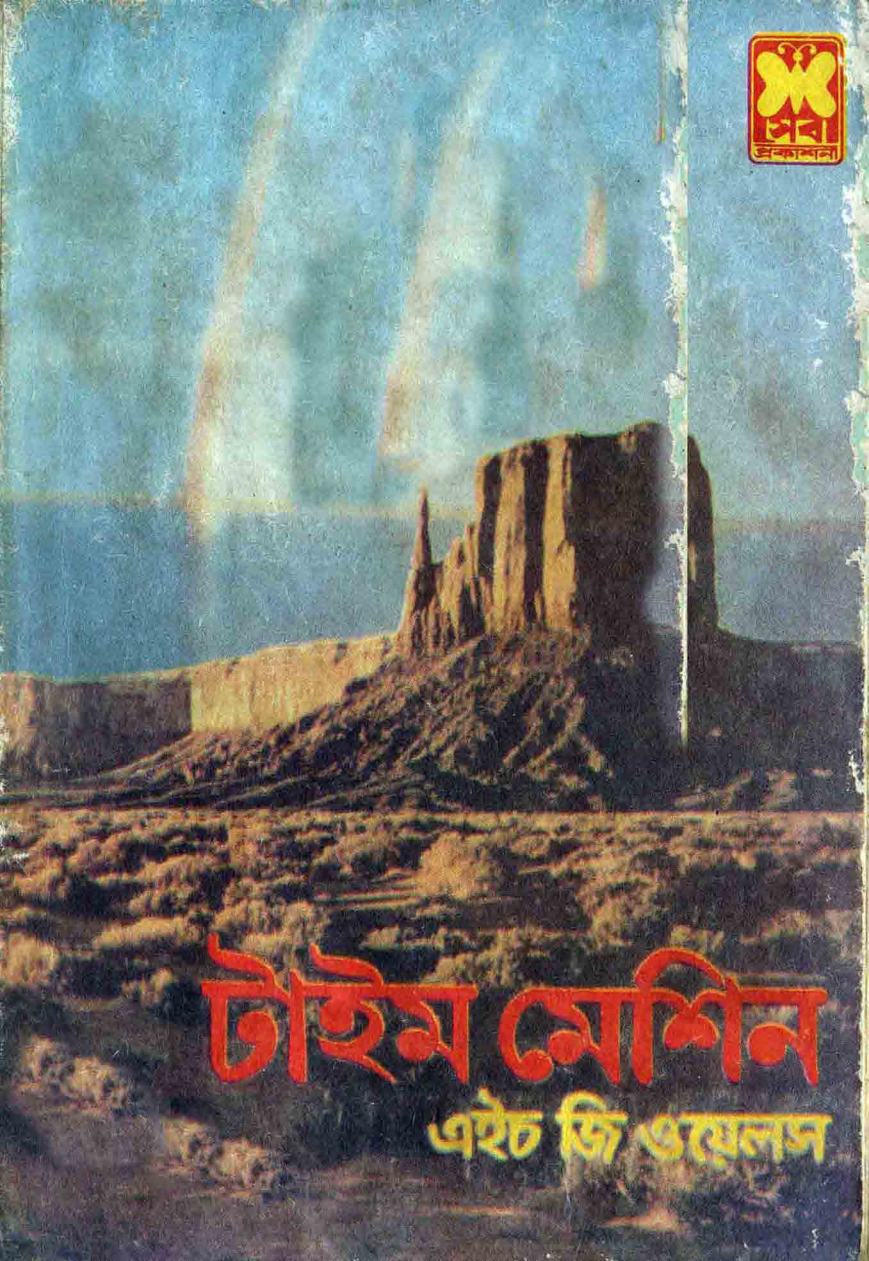

সেবা
প্রকাশনী
টাইম মেশিন
এইচ জি ওয়েলস

Visit www.banglapdf.net For
More Exclusive, High Quality,
Water-mark less
E-books.

Please Give Us Some Credit
When You Share Our Books.

And Don't Remove This
Page. Thank You.

-SHAMOL

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি এ-জাতীয় বই

স্টার ওয়রস
অদৃশ্য মানব
উড়ন্ত সসার
ভিনগ্রহের মানুষ (রহস্য)
ভিনগ্রহের মানুষ (প্রমাণ)
হারানো পৃথিবী
বিষবলয়

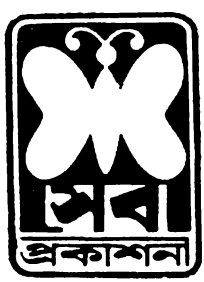

এইচ. জি. ওয়েলস-এর
বিশ্ববিখ্যাত সাইন্সফিকশন

টাইম মেশিন

রূপান্তর :

খসরু চৌধুরী

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৮৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান

মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি পি ও বক্স নং ৮৫০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৫/১০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১

TIME MACHINE
by H. G. Wells
Trans. Khashru Chowdhury

এইচ. জি. ওয়েলস-এর

টাইম মেশিন

রূপান্তর :

খসরু চৌধুরী

টাইম মেশিন

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৫

এক

ভূমিকা

রাতের খাবারের পর ঘরের মধ্যে আগুনের চারপাশে বসে আছি আমরা। ঘরের আনাচে-কানাচে আগুনের আভা ছড়াচ্ছে। টাইম ট্রাভেলার (অনেক ভেবে তাঁকে এই নামে ডাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছি আমরা) একটা গোপন, অত্যাশ্চর্য কাহিনী বলছেন আমাদের। তাঁর ধূসর চোখ মিটমিট করছে, মলিন মুখে যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে।

'আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। স্বতঃসিদ্ধ দু'একটা ধারণার অবশ্য বিরোধিতা করব আমি। এই যেমন ধরুন– জ্যামিতি। স্কুলে সবাই আপনারা জ্যামিতি পড়েছেন। এই জ্যামিতিও ভুল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত।'

'গোড়াতেই একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?' বললেন লালচুলো তর্কবাগীশ ফিলবি।

'আমি যদি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে না পারি তবু আপনাদের আমার কথা মানতে হবে, এমন দাবি করছি না। তবে আমি জানি আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন।– যা বলছিলাম, গণিতশাস্ত্রে খুব সূক্ষ্ম রেখার আসলে কোনও অস্তিত্ব নেই।'

'ঠিক,' বললেন মনোবিজ্ঞানী।

'শুধু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর ঘনত্ব থাকলেই সেটাকে ঘনবস্তু বলা যাবে না এ-ধরনের ঘনবস্তুর আসলে কোনও অস্তিত্বই নেই।'

'আপনার এ-বক্তব্যে আমার আপত্তি আছে। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ বিশিষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। খাঁটি সব বস্তুই…'

'বেশির ভাগ লোকের তাই ধারণা,' ফিলবিকে থামিয়ে দিলেন টাইম ট্রাভেলার। 'আচ্ছা, ক্ষণস্থায়ী কোনও ঘনবস্তু আছে?'

'আপনার কথা বুঝলাম না,' বললেন ফিলবি।

'যে-ঘনবস্তুর মুহূর্তকাল স্থায়িত্বও নেই, তার কোনও অস্তিত্ব আছে?'

ফিলবি উত্তর দিলেন না। মনে হলো, গভীর চিন্তায় তিনি মগ্ন।

'আরো পরিষ্কার করে বলছি,' টাইম ট্রাভেলার বলে চললেন, 'খাঁটি কোনও বস্তুর চারটা গুণ থাকতেই হবে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ঘনত্ব এবং স্থায়িত্ব। অথচ এই সত্য এড়িয়ে চলি আমরা। পরিমাপের আসলে চারটে ডাইমেনশন বা মাত্রা আছে। তিনটে তো আমরা জানি। চতুর্থটা হলো– সময়। তিন ডাইমেনশনের সঙ্গে সময়ের কোনও সম্পর্ক নেই এই বাজে কথাটা বলার প্রবণতা অনেকের মধ্যে আছে। কারণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের বোধ সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ধাবিত হয়।'

'হ্যাঁ,' নিবে যাওয়া চুরুট ধরাতে ধরাতে বলল এক অল্প বয়েসী যুবক, 'ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।'

যুবকের কথা শুনে টাইম ট্রাভেলারের মুখ আরও একটু উজ্জ্বল হলো। 'আশ্চর্যের বিষয়, এই স্বতঃসিদ্ধ কথাটা এতকাল এড়িয়ে চলা হয়েছে। অনেকেই ফোর্থ ডাইমেনশন ফোর্থ ডাইমেনশন বলে ঠিকই, কিন্তু এই ফোর্থ ডাইমেনশনটা যে সময়, তা জানে না। সময়ের সাথে আর তিন ডাইমেনেশনের কোনও পার্থক্য নেই। অথচ কিছু কিছু মূর্খ এই কথা মানতে চায় না। ফোর্থ ডাইমেনশন সম্বন্ধে তাদের বক্তব্য নিশ্চয় আপনারা সবাই জানেন। তাই না?'

'আমি জানি না,' বললেন প্রাদেশিক মেয়র।

'গণিতবেত্তাদের মতে যে-কোন ঘনবস্তুর তিনটে ডাইমেনশন থাকে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর ঘনত্ব। এই তিন মাত্রা পরস্পর সমকোণে অবস্থিত। কিন্তু কিছু দার্শনিকের প্রশ্ন হলো, ডাইমেনশন তিনটে কেন? আরেকটা ডাইমেনশন কেন এই তিনটের সাথে সমকোণে বিদ্যমান থাকবে না? তাঁরা এমন কি চার ডাইমেনশন-বিশিষ্ট জ্যামিতি চালু করার চেষ্টা পর্যন্ত করেছেন। প্রফেসর সাইমন নিউকম্ব মাসখানেক আগে নিউইয়র্ক ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটিতে প্রকাশ করেছেন এসব তথ্য। আপনারা জানেন, সমতল-ক্ষেত্রের মাত্র দুটো ডাইমেনশন আছে। অথচ এর ওপরে তিন ডাইমেনশন বিশিষ্ট কঠিন কোন বস্তু প্রদর্শন করা সম্ভব। তাঁরা বলছেন, বস্তুবিষয়ক পুরো জ্ঞান অর্জন করলে তিন ডাইমেনশন-বিশিষ্ট কোন মডেলের ওপর চতুর্থ ডাইমেনশনটাও আনা যাবে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বিড়বিড় করে বললেন মেয়র। তারপর ভ্রূ কুঁচকে যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন সব, এমন ভাব করে বসে রইলেন। ঠোঁট মৃদু মৃদু নড়ছে, যেন উচ্চারণ করছেন গূঢ় কোন শব্দ। 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি সবকিছু,' একটু পর বললেন তিনি।

'আপনাদের বলতে বাধা নেই, চার ডাইমেনশনের জ্যামিতি বিষয়ে আমিও কিছুদিন খাটাখাটুনি করেছি। কোন কোন পরীক্ষায় অদ্ভুত ফলও পেয়েছি। যেমন ধরুন, কোন মানুষের কয়েকটা পোর্ট্রেট। কোনটা আট বছর বয়সের, কোনটা পনেরো, কোনটা সতেরো, কোনটা আবার তেইশের। বোঝাই যাচ্ছে, এগুলো জীবনের বিভিন্ন ভাগ। ঠিক তেমনি চার ডাইমেনশনের বস্তুর ক্ষেত্রে তিন ডাইমেনশনের উপস্থিতি একটা অপরিবর্তনীয় ব্যাপার।

'বিজ্ঞানীরা খুব ভাল করেই জানেন,' টাইম ট্রাভেলার বলে চললেন, 'সময়ও একটা ক্ষেত্র বা পরিমাপ। এই দেখুন, একটা ডায়াগ্রাম। আবহাওয়ার রিপোর্ট। এই যে রেখাটিতে আমি আঙুল দিয়ে আছি, এটা ব্যারোমিটারের গতি-প্রকৃতি নির্দেশ করছে। গতকাল এটা উঁচুতে ছিল, রাতে নেমে যায়, আজ সকালে আবার উঠেছিল, বর্তমানে এই এখানে আছে। পরিমাপের সর্বজনস্বীকৃত ডাইমেনশনগুলোর একটার মধ্যেও পারদ রেখাটিকে খুঁজে পাচ্ছে না, এটা নিশ্চিত। তবে একটা রেখাকে পারদ ছুঁয়ে আছে, এটাও সত্যি। সেটাই হলো, সময়-টাইম ডাইমেনশন।'

'কিন্তু,' আগুনের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বললেন ডাক্তার, 'সময় যদি

পরিমাপের চতুর্থ ডাইমেনশনই হবে, তাহলে অন্য ডাইমেনশনগুলো থেকে সব সময় এটাকে আলাদা করে রাখা হচ্ছে কেন? আর পরিমাপের সব ডাইমেনশনগুলোতে যেমন আমরা যেতে পারি, তেমনি কেন সময়ের সাথে পারি না?'

টাইম ট্রাভেলার হাসলেন। 'আমরা যেখানে খুশি যেতে পারি এ-ব্যাপারে কি আপনি নিশ্চিত? ডানে-বাঁয়ে আমরা যেতে পারি, সামনে-পিছনেও যেতে পারি অনায়াসেই। দুটো ডাইমেনশনে আমরা ইচ্ছেমত চলাফেরা করতে পারি। কিন্তু ওপরে-নিচে? মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এখানে আমাদের বাধা দিচ্ছে।'

'না,' বললেন ডাক্তার, 'বেলুনে করে যাওয়া সম্ভব।'

'কিন্তু বেলুন আবিষ্কারের আগে ওপর দিকে যেতে পারত না মানুষ।'

'বেলুন আবিষ্কারের আগেও মানুষ ওপর দিকে, নিচের দিকে অল্পস্বল্প যেতে পারত।'

'ওপর দিকে যাওয়ার চেয়ে নিচের দিকে যাওয়া অনেক সোজা।'

'কিন্তু সময়ের ভেতর দিয়ে আপনি একটুও যেতে পারছেন না। বর্তমান সময় থেকে চুল পরিমাণ সরে যাওয়ার সাধ্যও আপনার নেই।'

'মাই ডিয়ার স্যার, এইখানেই তো ভুলটা করছেন। সারা পৃথিবী এইখানেই ভুল করছে। আমরা বর্তমান সময় থেকে প্রতি মুহূর্তেই সরে যাচ্ছি। স্মৃতি কোন বস্তু নয়, এর কোনও ডাইমেনশন নেই, কিন্তু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্মৃতি টাইম ডাইমেনশনে একটা নির্দিষ্ট গতিতে চলছে।'

'কিন্তু সবচেয়ে বড় অসুবিধাটা হচ্ছে,' বাধা দিলেন মনোবিজ্ঞানী, 'সব দিকেই আপনি যেতে পারবেন, সময় ছাড়া।'

'এটাই হলো আমার বিরাট আবিষ্কারের মূল বিষয়। কে বলল, মানুষ সময়ের সাথে যেতে পারে না? স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে, এমন কোন ঘটনা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘটনাটা ঘটার মুহূর্তে চলে যাই। সে-সময় কিছুটা অন্যমনস্কতা আসে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, হঠাৎ করে আমরা অতীতে চলে যাচ্ছি। তবে সেই অতীত মুহূর্তটিতে আমরা থেকে যেতে পারছি না। যতক্ষণ আমরা অতীতে থাকছি, একটা বর্বর বা হিংস্র পশু ওপর দিকে লাফিয়ে উঠেও ততক্ষণ থাকতে পারবে। কিন্তু হিংস্র পশুর চেয়ে সভ্য মানুষ অনেক উন্নত জীব। সে বেলুনে করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে হার মানাতে পারে। এতকিছু যদি মানুষ করতে পারে তাহলে কেন সে টাইম ডাইমেনশনে অতীত বা ভবিষ্যতে যেতে পারবে না?'

'যত্তসব বাজে প্যাচাল,' বললেন ফিলবি।

'বাজে প্যাচালের কি হলো?' টাইম ট্রাভেলারের জিজ্ঞাসা।

'এসব কথার পেছনে কোনও যুক্তি নেই।'

'কিসের যুক্তি?'

'দেখুন, তর্কের মাধ্যমে আপনি হয়তো কালোকে শাদা বলে প্রমাণ করতে পারবেন, কিন্তু আমি সেটা কখনও মেনে নেব না।'

'বেশ। তবে চার মাত্রার জ্যামিতি বিষয়ে আমার পরীক্ষার অনেকখানি এখন আপনারা বুঝতে পারছেন, এটা নিশ্চয় ঠিক। অনেক দিন আগে আমি একটা

মেশিনের ব্যাপারে ভাসা ভাসা চিন্তা করেছিলাম–'

'সময়ের ভেতর দিয়ে যাওয়ার মেশিন!' সাগ্রহে বলে উঠল অল্পবয়সী যুবক।

'মেশিনের চালক তার ইচ্ছেমত যে-কোন ডাইমেনশনে, এমন কি সময়ের ভেতর দিয়েও যেতে পারবে ওতে চড়ে।'

হা হা করে হেসে উঠলেন ফিলবি।

'আমি জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'আপনার এই যন্ত্র পেলে ঐতিহাসিকেরা বর্তে যাবে,' বললেন মনোবিজ্ঞানী। 'চিন্তা করে দেখুন তো, ঐতিহাসিক নিজে গিয়ে দেখে আসছে হেস্টিংসের যুদ্ধ। কি রকম হবে ব্যাপারটা!'

'আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিন্তু আবার স্বকালবিরোধী কাউকে সহ্য করতে পারতেন না,' ফোড়ন কাটলেন ডাক্তার। 'আপনার মেশিনে চড়ে অতীতে যাবার আগে কথাটা খেয়াল রাখবেন।'

'আহা, কেউ গ্রীক শিখতে চাইলে একেবারে হোমার কিংবা প্লেটোর কাছে গিয়ে শিখতে পারবে,' যুবকের মন্তব্য।

'সেক্ষেত্রে তারা আপনাকেই ডাকত। জার্মান পণ্ডিতেরা গ্রীকভাষার অনেক উন্নতি করেছে।'

'ভবিষ্যতে যেতে পারলে কেমন হবে! নিজের সমস্ত টাকা জমা দিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফেরত পাওয়া যাবে সুদসহ!' আবার যুবক।

'নতুন সমাজের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। ১০০% কম্যুনিস্টিক,' আমি বললাম।

'যত্তসব আজে বাজে ভাবনা,' এবারে মনোবিজ্ঞানী।

'হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়েছিল, আর সে কারণেই এতদিন চুপচাপ থেকেছি। এবার আমি–'

'পরীক্ষা করে দেখবেন?' আমি বললাম। 'এক্সপেরিমেন্টটা দেখাবেন আমাদের?'

'এক্সপেরিমেন্ট!' চিৎকার করে উঠলেন ফিলবি। উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন তিনি।

'ভাল করেই জানেন, আপনি প্রলাপ বকছেন,' বললেন মনোবিজ্ঞানী, 'তবু দেখা যাক আপনার এক্সপেরিমেন্ট।'

টাইম ট্রাভেলার আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর হাসিমুখেই বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। পায়ের স্যাণ্ডেলের শব্দ ধীরে ধীরে ল্যাবোরেটরির দিকে চলে গেল।

মনোবিজ্ঞানী তাকালেন আমাদের দিকে। চিন্তামগ্ন মুখ। 'কী দেখাতে চাইছেন ভদ্রলোক?'

'হাত সাফাইয়ের কোন ব্যাপার-স্যাপার হবে,' বললেন ডাক্তার।

বার্সলেমের এক জাদুকরের গল্প জুড়ে দিলেন ফিলবি। কিন্তু টাইম ট্রাভেলার ফিরে আসায় তাঁর গল্প আর শেষ হলো না।

দুই

মেশিন

চকচকে ধাতুর একটা ফ্রেম টাইম ট্রাভেলারের হাতে। ছোট সাইজের দেয়াল ঘড়ির চেয়ে সামান্য বড়, ভারি চমৎকারভাবে তৈরি। হাতির দাঁত আর স্ফটিকের মত স্বচ্ছ কিছু পদার্থও আছে ওতে। ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অষ্টকোণী টেবিলগুলোর একটা তুলে নিয়ে তিনি আগুনের সামনে রাখলেন। তার ওপর ফ্রেমটা রেখে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। টেবিলের ওপরে একটা ছোট শেড দেয়া বাতি। বাতির উজ্জ্বল আলো পড়েছে মেশিনের মডেলটার ওপর। ম্যান্টেলের ওপরের পিতলের মোমবাতিদানের দুটো আর কুলুঙ্গির মোমবাতিদানেরগুলো মিলিয়ে প্রায় ডজনখানেক মোমবাতির আলোয় সারা ঘর আলোকিত। আগুনের পাশে একটা নিচু আর্মচেয়ারে বসেছিলাম আমি, সেটা টেনে টাইম ট্রাভেলার এবং ফায়ারপ্লেসের মাঝামাঝি জায়গায় নিয়ে এলাম। পেছনে বসা ফিলবি টাইম ট্রাভেলারের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছেন। ডাক্তার আর মেয়র ডানপাশে, বাঁপাশে মনোবিজ্ঞানী। যুবক দাঁড়িয়ে আছে মনোবিজ্ঞানীর পেছনে। যেভাবে সতর্ক হয়ে আছি সবাই, এ অবস্থায় কোনও কেরামতি কেউ দেখাতে পারবে, আমার বিশ্বাস হয় না।

টাইম ট্রাভেলার একবার আমাদের ওপর নজর বুলিয়ে মডেলটির দিকে তাকালেন।

'তারপর?' মনোবিজ্ঞানীর জিজ্ঞাসা।

'এই ছোট্ট মেশিনটা,' টেবিলের ওপর দু'কনুই রেখে বললেন টাইম ট্রাভেলার, 'আমার পরিকল্পনার একটা মডেল মাত্র। নিশ্চয় খেয়াল করেছেন, এটা একটু তির্যক। এই যে গরাদটা, এমনভাবে ঝিক্‌মিক্ করে এটা যে মাঝে মাঝে সন্দেহ হতে পারে এখানে কোনও গরাদ আদৌ আছে কিনা। আর এই শাদা দুটো হচ্ছে লিভার।'

ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে ভালভাবে খেয়াল করে বললেন, 'সত্যি, খুব চমৎকারভাবে তৈরি করা হয়েছে মডেলটা।'

'দু'-দুটো বছর লেগেছে এটা তৈরি করতেই,' টাইম ট্রাভেলারের কণ্ঠে রহস্যের আভাস। 'এই লিভারটা ওপর দিকে ঠেলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেশিন ভবিষ্যতের দিকে রওনা দেবে, অন্য লিভারটা টানলে ফিরে আসতে শুরু করবে আবার। আর এই যে গদি, চালকের আসন এটা। এখন আমি ওই লিভার ধরে টান দেব, তৎক্ষণাৎ চালু হয়ে যাবে মেশিন। যেহেতু ভবিষ্যতে চলে যাবে এটা, অদৃশ্য হয়ে যাবে আমাদের চোখের সামনে থেকে। মেশিন এবং টেবিলের দিকে ভাল করে নজর রাখবেন, কিছুতেই যেন আপনাদের মনে না হয়, আমি কোনও চালাকি করছি। মডেলটা নষ্ট করার পরও বদনাম হোক, এটা আমি চাই না।'

মিনিটখানেক চুপচাপ থাকল সবাই। মনোবিজ্ঞানী আমাকে কিছু বলতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত বললেন না। লিভারের দিকে আঙুল বাড়িয়েও আবার হাত টেনে নিলেন টাইম ট্রাভেলার, মনোবিজ্ঞানীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'দেখি, আপনার হাতটা দিন তো এদিকে।' তর্জনী বাড়াতে বললেন। টাইম মেশিনকে সীমাহীন যাত্রার দিকে রওনা করানোর ভার পড়ল মনোবিজ্ঞানীর ওপর।

লিভার ঠেলে দেয়াটা আমরা সবাই দেখলাম। হঠাৎ করেই দমকা বাতাস বয়ে গেল, লাফিয়ে উঠল বাতির শিখা। ম্যান্টেলের ওপরের একটা মোমবাতি নিবে গেল দপ করে, বোঁ করে ঘুরে গেল ছোট্ট মেশিনটা। দেখতে দেখতে ঝাপসা হয়ে গেল, মুহূর্তের জন্যে ঝিকমিক করে উঠল পিতল আর হাতির দাঁত, তারপরই একেবারে অদৃশ্য! টেবিলের ওপর বাতিটা ছাড়া আর কিছুই নেই!

মিনিটখানেক কারও মুখে কথা সরল না।

মনোবিজ্ঞানী বিস্ময় কিছুটা কাটিয়ে উঠে টেবিলের নিচে উঁকি দিয়ে দেখলেন। তাঁর কাণ্ড দেখে হাসলেন টাইম ট্রাভেলার। 'তারপর?' মনোবিজ্ঞানীর গলা নকল করে বললেন। ম্যান্টেলের কাছে উঠে গিয়ে তামাকের কৌটো খুলে তামাক ভরতে লাগলেন পাইপে।

আমরা একে অন্যের দিকে তাকালাম। 'দেখুন,' বললেন ডাক্তার, 'আপনি ঠাট্টা করছেন না তো? আপনার মেশিন সময়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, এ-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত?'

'অবশ্যই,' ঝুঁকে পাইপে আগুন দিতে দিতে বললেন টাইম ট্রাভেলার। সোজা হয়ে তাকালেন মনোবিজ্ঞানীর দিকে। এসব দেখে মোটেও বিস্মিত হননি, এমন ভাব দেখাতে গিয়ে অদ্ভুত এক কাণ্ড করলেন মনোবিজ্ঞানী। চুরুটের মুখ না কেটেই আগুন ধরাতে চেষ্টা করলেন। 'যে মডেলটা আপনারা দেখলেন, অমন একটা বড়ো মেশিন প্রায় তৈরি করে ফেলেছি ওখানে,' ল্যাবোরেটরির দিকে দেখালেন টাইম ট্রাভেলার, 'মেশিনটাতে চড়ে এবার আমি নিজেই রওনা দেব ভাবছি।'

'আপনি কি বলতে চান, আপনার মেশিনটা ভবিষ্যতে চলে গেল?' ফিলবির প্রশ্ন।

'ভবিষ্যতে কিংবা অতীতে, ঠিক বলতে পারব না কোথায় গেল।'

'যদি সত্যি কোথাও গিয়ে থাকে তাহলে ওটা অতীতেই গেছে, কোনও সন্দেহ নেই,' একটু ধাতস্থ মনে হল মনোবিজ্ঞানীকে।

'কেন?' বললেন টাইম ট্রাভেলার।

'কারণ আমার মনে হয় ওটা শূন্য দিয়ে যাচ্ছে না। যেহেতু সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতে গেলে ওটা এখনও এই টেবিলের ওপরেই থাকত।'

'কিন্তু,' বললাম আমি, 'যদি অতীতেই যেত তাহলে প্রথমে ঘরে ঢুকেই দেখা যেত মেশিনটাকে। গত বৃহস্পতিবারে যখন এসেছিলাম তখনও দেখা যেত। তার আগের বৃহস্পতিবারেও। তার আগেও– এমনি আর কি।'

'মারাত্মক সব আপত্তি দেখা যাচ্ছে,' টাইম ট্রাভেলারের দিকে ঘুরে নিরপেক্ষ মতামত পেশ করলেন প্রাদেশিক মেয়র।

'আপত্তির আসলে কোনও কারণ নেই,' বললেন টাইম ট্রাভেলার। মনোবিজ্ঞানীর দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি জানেন। বুঝিয়ে বলতেও পারবেন। শারীরবৃত্তের নিচে দিয়ে উপস্থাপনা– এটা জানেন আপনি। তরলীকৃত উপস্থাপনা।'

'অবশ্যই,' বললেন মনোবিজ্ঞানী, 'এটা মনোবিজ্ঞানের খুব সাধারণ একটা বিষয়। আমার আগেই ধারণা করা উচিত ছিল। এটা খুব সোজা। প্রচলিত মতবিরোধী যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা চলছে সেটাকে সমর্থনও করছে। মেশিনটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। উপলব্ধি করতেও পারছি না। চাকা ঘোরার সময়– স্পোকগুলোকে যেমন দেখায়, কিংবা বাতাস কেটে ছোটার সময় বুলেটকে, সেরকম একটা ব্যাপার। তার বেশি দেখা যাবে না। আমাদের গতির চেয়ে পঞ্চাশ কি একশোগুণ বেশি গতিতে যদি ওটা সময়ের ভেতর দিয়ে যায়, এক মিনিটে আমরা যতখানি যাই ততখানি যদি যায় এক সেকেণ্ডে, তাহলে অবশ্যই মেশিনটার আসল চেহারার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ বা একশো ভাগের এক ভাগই শুধু দেখা যাবে। খুব সোজা ব্যাপার।' যেখানে মেশিনটা ছিল সেদিক দিয়ে হাত চালিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখা যাচ্ছে?' হেসে উঠলেন।

ফাঁকা টেবিলটির দিকে তাকিয়ে আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম আমরা। তারপর টাইম ট্রাভেলার জানতে চাইলেন সবকিছু দেখেশুনে আমাদের কী ধারণা হচ্ছে।

'আজ রাতে অন্তত বিশ্বাসযোগ্যই মনে হচ্ছে,' বললেন ডাক্তার, 'কিন্তু কাল সকাল পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। মাথা কেমন গুলিয়ে গেছে। পরিষ্কার মাথায় চিন্তা করতে হবে সকালে।'

'আপনারা কি টাইম মেশিনটা দেখতে চান?' বললেন টাইম ট্রাভেলার। তারপর বাতি হাতে টানা করিডোর ধরে ল্যাবোরেটরির দিকে এগোলেন। পিছনে পিছনে চললাম আমরা। মৃদু মৃদু কাঁপছে বাতির শিখা, টাইম ট্রাভেলারের বড়ো মাথাটার ছায়া পড়েছে, নাচছে আরও অনেক ছায়া। ল্যাবোরেটরিতে আমরা বড়ো একটা মেশিন দেখলাম। যেটা অদৃশ্য হয়ে গেল, হুবহু সেটার মতই দেখতে। কিছুটা নিকেল, কিছুটা হাতির দাঁত, রক ক্রিস্ট্যাল, এসব দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওটা। কাজ প্রায় শেষ, বাঁকানো গরাদগুলো শুধু পড়ে আছে একটা বেঞ্চের পাশে। বেঞ্চটার ওপরে নকশা আঁকা কিছু কাগজ। একটা গরাদ নিয়ে ভাল করে লক্ষ করলাম। মনে হলো, স্ফটিকের।

'এখনও ভেবে দেখুন,' বললেন ডাক্তার, 'আপনি সিরিয়াস তো? নাকি গত ক্রিসমাসে আমাদের যে ভূত দেখিয়েছিলেন, সেরকম কোনও কেরামতি?'

বাতি ওপরে তুলে ধরলেন টাইম ট্রাভেলার, 'ওতে চড়ে মহাকালের রহস্য অনুসন্ধানে যাব আমি। বোঝা গেছে? জীবনে এত সিরিয়াস কোনও বিষয়েই হইনি।'

আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না, এর উত্তরে কী বলা উচিত।

ডাক্তারের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাতে চোখাচোখি হলো ফিলবির সঙ্গে। অর্থপূর্ণভাবে চোখ পিটপিট করলেন তিনি।

তিন

টাইম ট্রাভেলারের প্রত্যাবর্তন

এতকিছু দেখেও টাইম মেশিন সম্বন্ধে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে পারিনি আমরা কেউই। টাইম ট্রাভেলারের মত ধূর্ত মানুষদের ওপর আস্থা রাখা কঠিন। এই ধরনের লোককে কখনও সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। টাইম মেশিনটা যদি ফিলবি আমাদের দেখাতেন, খুব সহজেই হয়তো বিশ্বাস করতাম আমরা।

প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা এখানে মিলিত হই। গত বৃহস্পতিবারে দেখার পর থেকে জিনিসটা আমাদের মন জুড়ে আছে এটা সত্যি, তবু কেন জানি পুরো বিশ্বাস করতে পারছি না। বার বার মনে হচ্ছে, কী যেন একটা চালাকি আছে এসবের ভেতরে। শুক্রবার লিনায়েনে ডাক্তারের সাথে এ-বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এ-জাতীয় একটা চালাকি তিনি নাকি দেখেছেন টুবিনজিনে। মোমবাতি নিবে গিয়েছিল সেখানেও। তবে কায়দাটা তিনি ধরতে পারেননি।

পরের বৃহস্পতিবারে আবার গেলাম রিচমণ্ডে। ড্রয়িং রুমে চার পাঁচজন লোক বসে আছে। ফায়ারপ্লেসের সামনে ডাক্তার দাঁড়িয়ে। তাঁর একহাতে এক শীট কাগজ, আরেক হাতে ঘড়ি। টাইম ট্রাভেলার নেই। 'সাড়ে সাতটা বাজল,' বললেন ডাক্তার। 'খাবার সেরে নেয়াই বোধহয় ভাল।'

'উনি কোথায়?' জানতে চাইলাম আমি।

'এইমাত্র এলেন? সাতটার মধ্যে উনি না এলে খাবার সেরে নিতে বলেছেন। দেরি হতে পারে, এরকম আভাস আগেই দিয়েছেন আমাকে। দেরি হলে ফিরে নাকি কারণ ব্যাখ্যা করবেন।'

'দেরি করে খাবার নষ্ট করাটা ভাল হবে না বোধহয়,' মন্তব্য করলেন খুব চালু এক দৈনিকের সম্পাদক। বেল বাজালেন ডাক্তার।

গত বৃহস্পতিবারে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শুধু ডাক্তার আর মনোবিজ্ঞানী এসেছেন আজ। নতুন এসেছেন ব্ল্যাঙ্ক, সেই সম্পাদক, একজন সাংবাদিক এবং শান্ত, লাজুক এক দাড়িঅলা লোক। এঁকে চিনলাম না। টাইম ট্রাভেলারের অনুপস্থিতি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কিছু কল্পনা করতে লাগলেন। আমিও একটু রসিকতা করলাম টাইম ট্রাভেলিং নিয়ে। সম্পাদক গোটা ঘটনাটা শুনতে চাইলে নীরসভাবে বর্ণনা করতে লাগলেন মনোবিজ্ঞানী। তাঁর গল্প অর্ধেক শেষ হয়েছে এমন সময়ে খুব ধীরে খুলে গেল করিডোরের দিকের দরজাটা। দরজায় দাঁড়িয়ে টাইম ট্রাভেলার।

'যাক, শেষমেশ এলেন তাহলে!' দরজামুখো দাঁড়িয়ে থাকায় আমিই প্রথমে দেখতে পেলাম। ভাল করে খেয়াল করে একটা বিস্ময়ের ধ্বনি বেরুলো আমার গলা থেকে।

'হায় ঈশ্বর! এ-অবস্থা কেমন করে হলো?' এবার দেখতে পেয়েছেন ডাক্তার।

ঘরের সবগুলো মাথা ঘুরে গেল টাইম ট্রাভেলারের দিকে।

তাঁর চেহারার এই দুর্দশা বিস্ময়কর। ধুলোয় নোংরা কোট, হাতার নিচের দিকে সবুজ রঙের আঠালো কি যেন চকচক করছে। উসকো-খুসকো চুল, ধূসর রঙ ধূসরতর হয়েছে। ধুলো লেগে, নাকি রঙই নষ্ট হয়ে গেছে, বোঝা যায় না। ভয়ঙ্কর ফ্যাকাসে মুখ; আধা শুকনো একটা কাটা দাগ চিবুকের ওপর। সব মিলিয়ে কেমন একটা খেপাটে অভিব্যক্তি। দরজায় দাঁড়িয়ে খানিক ইতস্তত করলেন, যেন আলোতে ধাঁধিয়ে গেছে চোখ। তারপর ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। ঈষৎ খোঁড়াচ্ছেন, ক্ষত-বিক্ষত পায়ে ভবঘুরেরা যেমন খোঁড়ায়। আমরা চুপচাপ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কখন কথা বলেন, এই আশায়।

কোনও কথা বললেন না তিনি। টেবিলের কাছে গিয়ে পানীয়ের দিকে ইশারা করলেন। এক গ্লাস শ্যাম্পেন এগিয়ে দিলেন সম্পাদক। গ্লাসটা নিঃশেষ করার পর একটু ধাতস্থ মনে হলো তাঁকে। টেবিলের চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন, স্বভাবসিদ্ধ হাসির কিছুটা আভাসও দেখা গেল ঠোঁটে।

'হায়! হায়! কোন্ চুলোয় গিয়েছিলেন আপনি?' ডাক্তারের বিস্ময়।

'এখুনি বলে আপনাদের বিরক্ত করতে চাই না। তবে আমি– আমি ঠিকই আছি,' স্খলিত উচ্চারণে কথাক'টি বললেন টাইম ট্রাভেলার। আবার গ্লাস বাড়ালেন, শ্যাম্পেন নিয়ে শেষ করে ফেললেন এক চুমুকে। কিছুটা উজ্জ্বল হলো চোখ। রক্ত ফিরে এল চিবুকে। প্রথমে আমাদের ওপর, তারপর সারা ঘরে ঘুরে এল তাঁর দৃষ্টি। 'গোসল করে সাফ-সুতরো হয়ে আসি, তারপর বলব, সবকিছুই খুলে বলব।...আমার জন্যে কিছু খাসির মাংস রাখবেন। খুব খিদে পেয়েছে।' সম্পাদকের দিকে চোখ পড়লে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন করতেই সম্পাদককে থামিয়ে দিলেন টাইম ট্রাভেলার, 'বুঝতে পারছি, কেমন অদ্ভুত চেহারা হয়েছে আমার। ভাববেন না, ঠিক হয়ে যাবে এখুনি।'

গ্লাস রেখে সিঁড়ির দরজার দিকে এগোলেন তিনি। ভাল করে খেয়াল করলাম, সত্যিই কিছুটা খোঁড়াচ্ছেন। দাঁড়িয়ে তাঁর পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি, ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত একজোড়া মোজা পায়ে। তাতে ছোপ ছোপ রক্ত। তাঁর স্বাভাবিক আচরণের সাথে আজকের কোনকিছুরই মিল নেই, এ কথা ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। সংবিৎ ফিরল সম্পাদকের কথায়। 'বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের অদ্ভুত আচরণ'– মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁর কাগজের হেড লাইন নিয়ে।

'আসলে ব্যাপারটা কি?' বললেন বিস্মিত সাংবাদিক। 'শখের ভিক্ষুক সাজতে গিয়েছিলেন নাকি তিনি? উঁহুঁ, কিছুই বুঝলাম না।'

মনোবিজ্ঞানীর দিকে তাকিয়ে মনে হলো, আমার মত তিনিও খোঁড়ানটা লক্ষ করেছেন। আর কেউ নয়।

সর্বপ্রথম বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠলেন ডাক্তার। চট্‌পট্ গরম খাবার চাইলেন এক প্লেট। খাবার পরিবেশন করার জন্যে বেল বাজানর পর চাকরদের দাঁড় করিয়ে রাখা একদম পছন্দ করেন না টাইম ট্রাভেলার। ছুরি, কাঁটা হাতে নিলেন সম্পাদক। তাঁর দেখাদেখি চুপচাপ শান্ত লোকটাও। শুরু হলো ভোজ। বিস্মিত

আলাপ চলল খেতে খেতে।

'আমাদের বন্ধু কি আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ খুঁজে পেয়েছেন? না কি নেবুচাদনেজারের ঘোর কাটেনি এখনও?' চূড়ান্ত কৌতূহল প্রকাশ করলেন সম্পাদক।

'মনে হয়, টাইম মেশিন নিয়েই কিছু একটা ঘটেছে,' বললাম আমি। তারপর মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে আমার যে-কথাবার্তা হয়েছিল, খুলে বললাম সব।

নবাগত অতিথিরা হেসেই উড়িয়ে দিলেন আমার কথা। আপত্তি জানালেন সম্পাদক। 'এই টাইম ট্রাভেলিং বিষয়টা কী? শুধুমাত্র নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্যে কেউ ধুলোয় গড়াগড়ি যেতে পারেন না।' এরপরই শুরু হয়ে গেল উপহাস। ভবিষ্যতের মানুষের কি কাপড় ঝাড়া ব্রাশ নেই? সাংবাদিকও বিশ্বাস করেননি, সুতরাং দু'জনে মিলে গোটা জিনিসটাকে হাস্যকর প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় মাতলেন। দু'জনেই উৎফুল্ল, কিন্তু সাধারণ শ্রদ্ধাবোধটুকু পর্যন্ত নেই– এ-যুগের পক্ষে এ ধরনের সাংবাদিকেরাই বোধ হয় মানানসই।

'আগামীকাল আমাদের স্পেশাল করেসপণ্ডেন্ট লিখবেন,' বললেন সাংবাদিক, চিৎকার করলেন বলাই ভাল, ঠিক এসময় ঘরে ঢুকলেন টাইম ট্রাভেলার। সাধারণ সান্ধ্য পোশাকে ফিরে এসেছে তাঁর আসল চেহারা।

'এঁরা বলছিলেন,' হাসতে হাসতে বললেন সম্পাদক, 'আপনি নিশ্চয় আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি বেড়াতে গিয়েছিলেন! রোজবেরীর কি হয়েছে খুলে বলুন না। বলবেন? এই সংবাদ দেয়ার জন্যে কত চান, তাও বলুন।'

নিজের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানটিতে এসে বসলেন টাইম ট্রাভেলার। স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে বললেন, 'কই, আমার খাসির মাংস কই? আবার কাঁটা চামচ দিয়ে মাংস খাব, ভাবতেও কেমন লাগছে!'

'গল্প পাওয়া গেছে!' গলা চড়ালেন সম্পাদক।

'চুলোয় যাক আপনার গল্প!' বললেন টাইম ট্রাভেলার। 'আগে কিছু খাবার দরকার। সাফ কথা, পেটে কিছু না দেয়া পর্যন্ত একটা কথাও বলব না আমি। এই তো এসে গেছে। থ্যাঙ্ক ইউ। আর হ্যাঁ, লবণ চাই।'

'একটা কথা,' বললাম আমি, 'হ্যাভ ইউ বিন টাইম ট্রাভেলিং?'

খাবারে মুখ ভর্তি, কথা বলতে পারলেন না টাইম ট্রাভেলার, মাথা নেড়ে জানালেন– ঠিক।

'সত্যি বলছি, প্রতি লাইন সংবাদের জন্যে এক শিলিং করে দেব আমি,' বললেন সম্পাদক।

শান্তশিষ্ট লোকটার দিকে গ্লাস বাড়িয়ে নখ দিয়ে ঠুনঠুন করে বাজালেন টাইম ট্রাভেলার। পানীয় ঢেলে দেয়া হলো তাঁর গ্লাসে। অস্বস্তিকর এক পরিবেশের সৃষ্টি হলো। জমল না আর ডিনার। থেকে থেকেই প্রশ্ন করার ইচ্ছে হলো আমার, কিন্তু এই প্রশ্নগুলোই নিশ্চয় উঁকি দিচ্ছে আর সবার মনে– ভেবে মুখ খুললাম না। হেটি

প্রায় চার গ্যালনের বিশাল বোতলে এই মদ থাকে।

পটারের গল্প বলা শুরু করলেন সম্পাদক। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়– টেনশনমুক্ত হওয়া। টাইম ট্রাভেলারের খাওয়া দেখে মনে হলো যেন কতদিনের ক্ষুধার্ত। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে তাঁকে লক্ষ করছিলেন ডাক্তার। আগের চেয়েও ঝিমিয়ে গেলেন দাড়িঅলা ভদ্রলোক। গ্লাসের পর গ্লাস শ্যাম্পেন শেষ করতে দেখে বোঝা গেল কতোখানি নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

অবশেষে খাওয়া শেষ হলো টাইম ট্রাভেলারের। আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার বোধহয় ক্ষমা চাওয়া উচিত। এত খিদে পেয়েছিল! ভীষণ অদ্ভুত সময় কাটিয়েছি আমি।' হাত বাড়ালেন চুরুটের জন্যে। 'চলুন, স্মোকিং রুমে যাওয়া যাক। এত বড় একটা গল্প খাবারের টেবিলে বসে বলা সম্ভব নয়।' বেল বাজিয়ে পাশের কামরার দিকে এগোলেন তিনি।

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আমার কাছে জানতে চাইলেন, 'ব্ল্যাঙ্ক, ড্যাশ আর কোজকে নিশ্চয় বলেছেন মেশিন সম্বন্ধে?'

'আপনার গল্প কিন্তু বর্তমান যুগে অচল,' বললেন সম্পাদক।

'আজ রাতে কোনও তর্ক করতে চাই না আমি। গল্পটা আপনাদের বলতে কোন বাধা নেই, কিন্তু তর্ক করার ইচ্ছে একেবারেই নেই আমার। আপনারা যদি শুনতে চান, কী কী ঘটেছিল সবই বলব। কিন্তু কথা হলো, গল্পের মাঝপথে বাধা দিতে পারবেন না। গল্পের অধিকাংশই হয়তো মিথ্যে মনে হবে, কিন্তু এর প্রত্যেকটি অক্ষর সত্যি। চারটের সময় আমি ল্যাবোরেটরিতে ছিলাম, তারপর···আট আটটা এমন দিন কাটিয়েছি আমি যে···যে-ধরনের একটা দিনও কাটায়নি কোনকালের কোন মানুষ। ক্লান্তিতে সারা শরীর ভেঙে পড়ছে, তবু গল্পটা না বলা পর্যন্ত আমি শুতে যাব না। কিন্তু ওই যে বললাম, কোনরকম নাক গলানো চলবে না। রাজি?'

'রাজি,' বললেন সম্পাদক। তাঁর সাথে গলা মেলালাম আমরা সবাই।

চেয়ারে হেলান দিয়ে খুবই ক্লান্ত ভঙ্গিতে নিচু গলায় গল্প শুরু করলেন টাইম ট্রাভেলার। পরে আস্তে আস্তে কিছুটা সজীবতা অবশ্য এল গলায়। আমার মনে হচ্ছে, কোনও কলম বা কালিই উপযুক্ত নয় এ-গল্প লেখার পক্ষে। গল্পের পুরো মাহাত্ম্য বর্ণনা করা আমার সাধ্যের বাইরে। আমি জানি, যাঁরা পড়বেন, খুব মনোযোগ দিয়েই পড়বেন এই গল্প। কিন্তু কেউ তো দেখতে পাবেন না বাতির ম্লান আলোয় টাইম ট্রাভেলারের সেই মুখ। শুনতে পাবেন না সেই অপূর্ব স্বরভঙ্গি। গল্পের মোড় নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অভিব্যক্তির পরিবর্তন! স্মোকিং রুমে কোন মোমবাতি নেই। আমরা প্রায় সবাই ছায়ায় বসে আছি। সাংবাদিকের মুখ আর দাড়িঅলা ভদ্রলোকের হাঁটুর নিচে শুধু পড়েছে ছোট বাতিটার আলো। আমরা আরেকবার সবাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। পরে শুধুই চেয়ে থাকলাম টাইম ট্রাভেলারের মুখের দিকে।

চার

টাইম ট্রাভেলিং

গত বৃহস্পতিবারে টাইম মেশিনের মূল উপাদানগুলো সম্বন্ধে বলেছিলাম। অসম্পূর্ণ অবস্থায় আপনারা ওটাকে দেখেছেন ওয়র্কশপে। এখনও ওটা একই জায়গায় আছে। যাত্রার ধকলে শুধু চেহারা বদলেছে কিছুটা। হাতির দাঁতের একটা গরাদ ভেঙেছে, বেঁকে গেছে পিতলের একটা গরাদ, এ ছাড়া মোটামুটি ঠিকই আছে। যাই হোক, ভেবেছিলাম শুক্রবারে তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু গরাদগুলো লাগাতে গিয়ে দেখি, নিকেলের একটা গরাদ ইঞ্চিখানেক খাটো। আবার নতুন করে তৈরি করতে হলো। ফলে সময় লেগে গেল আরও বেশি। সকাল দশটায় যাত্রা শুরু করেছিল পৃথিবীর সর্বপ্রথম টাইম মেশিন। তৈরি শেষ হলে আরেকবার ভাল করে দেখে, স্ক্রুগুলো পরীক্ষা করলাম। তারপর স্ফটিকের রডে তেল দিয়ে বসে পড়লাম গদিতে।

'আত্মহত্যা করতে গিয়ে নিজের খুলিতে পিস্তল ধরলেও যেমন বোঝা যায় না, গুলি করলে কেমন লাগবে, ঠিক তেমনি অবস্থা হলো আমার। বসলাম ঠিকই, কিন্তু কী ঘটতে যাচ্ছে, কিছুই জানি না। চালু করার লিভারটা এক হাতে ধরে, থামানরটা ধরলাম আরেক হাতে। চালু করেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিলাম মেশিন। বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথা। যেন দুঃস্বপ্ন দেখলাম একটা। চারদিকে তাকালাম। যেমন ছিল, তেমনই আছে ল্যাবোরেটরি। কিছুই কি ঘটেনি তাহলে? মুহূর্তের জন্যে মনে হল, এত পরিশ্রমে তৈরি করা জিনিসটা মিথ্যে হয়ে গেল? হঠাৎ চোখ পড়ল ঘড়ির দিকে। একটু আগেই দেখেছি, দশটা এক কি দুই মিনিট ছিল, কিন্তু এখন বাজে প্রায় সাড়ে তিনটে!

'স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম আমি। দাঁতে দাঁত চেপে দু'হাতে ধরলাম চালু করার লিভার, ঠেলে দিলাম সজোরে। ল্যাবোরেটরির আলো কমতে কমতে নেমে এল অন্ধকার। মিসেস ওয়াচেট ঘরের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেল বাগানের দরজার দিকে। পরিষ্কার বুঝলাম, আমাকে দেখতে পায়নি। ওই জায়গাটুকু পার হতে তার বড়োজোর মিনিটখানেক লাগার কথা, কিন্তু আমার মনে হলো রকেটের মত ঘরটা অতিক্রম করে গেল সে। লিভার আরও ঠেলে সর্বোচ্চ গতি তুললাম। দপ্ করে যেমন বাতি নেবে, তেমনি হঠাৎ নেমে এল রাত। পরমুহূর্তেই পরদিন। আবার আলো কমতে লাগল ল্যাবোরেটরির, কমতেই থাকল। রাত নামল। তারপর দিন, রাত, আবার দিন, আবার রাত। গতি বেড়েই চলল মেশিনের। দু'কান জুড়ে ভোঁ ভোঁ শব্দ, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম।

'টাইম ট্রাভেলিংয়ের সময় কেমন লাগে, ব্যাপারটা বোধহয় ঠিকঠাক বোঝাতে পারছি না আপনাদের। সে এক সাংঘাতিক অস্বস্তিকর অবস্থা। মনে হয়, সর্পিল কোন পথ বেয়ে উঠেছি পাহাড়ে, তারপর পা হড়কে মাথা নিচের দিকে করে পড়ছি

তো পড়ছিই। করার কিছু নেই, অল্পক্ষণের মধ্যেই হাড়গোড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। মেশিনের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কালো একটা পাখা ঝাপটানর মত রাতের পিছু পিছু আসতে লাগল দিন। ল্যাবোরেটরির কোনকিছুর দিকে আর নজর গেল না আমার। সূর্য উঠছে, ঝাঁ করে চলে যাচ্ছে আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। প্রতি মুহূর্তেই দিন বদল হচ্ছে একটা করে। মনে হচ্ছে, ধ্বংস হয়ে গেছে ল্যাবোরেটরি, চলে এসেছি খোলা আকাশের নিচে। এত দ্রুত কেটে যাচ্ছে সময় যে, আশপাশের চলমান কোনও জিনিসের দিকে খেয়াল রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সবচেয়ে মন্থর শামুকের গতিও বেড়ে গেছে আমার চেয়ে অনেক। আর প্রতিমুহূর্তে ঝপাঝপ আলো আর আঁধারের পরিবর্তনটাও চোখের পক্ষে খুবই পীড়াদায়ক। আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে দেখলাম– এই নতুন চাঁদ, পরক্ষণেই পূর্ণিমা। সঙ্গে নক্ষত্ররাজির ঝিকিমিকি।

'গতি বাড়ছে এখনও। রাত আর দিনের মাঝে শুধু যেন একটা ধূসর রঙের পর্দা। গাঢ় নীল আকাশ। গোধূলি শুরুর রঙের মত জ্বলছে। সূর্য যেন বাঁকা আগুনের উজ্জ্বল ধনুক। চাঁদ পরিণত হলো তরঙ্গায়িত ম্রিয়মাণ আলোর রেখায়। কোনও তারা আর চোখে পড়ছে না। শুধু নীলের মাঝে উজ্জ্বলতর একটা গোল রেখা। এই দেখা দিচ্ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

'সমগ্র দৃশ্যপট কুয়াশাচ্ছন্ন। অস্পষ্ট। যে-পাহাড়ের পাশে আমার বাসা, এখনও আমি সেখানেই আছি। বেড়ে ওঠা গাছ ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদল করছে কুণ্ডলী পাকানো বাষ্পের মত। এই বাদামী, আবার সবুজ। বেড়ে উঠছে, ডাল-পালা মেলে দিচ্ছে চারপাশে, তারপর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কাঁপতে কাঁপতে। স্বপ্ন দেখার মত চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে বিশাল, চমৎকার সব বিল্ডিংয়ের সারি। গোটা পৃথিবীর খোলসটাই যেন গলে বয়ে যাচ্ছে আমার চোখের সামনে দিয়ে। গতি পরিমাপক ডায়ালের দিকে তাকালাম। দ্রুত থেকে দ্রুততর গতির নির্দেশ দিচ্ছে কাঁটা। এক অয়ন থেকে আরেক অয়নে ধাবিত হচ্ছে সূর্য এক মিনিট বা তারচেয়েও কম সময়ে। অর্থাৎ, এখন আমি মিনিটে এক বছরেরও বেশি সময় অতিক্রম করছি! সারা পৃথিবী বরফের কম্বল মুড়ি দিচ্ছে। পরমুহূর্তেই গায়ে দিচ্ছে বসন্তের উজ্জ্বল সবুজ পাতার জামা।

'অস্বস্তিকর অনুভূতিটা এখন একটু কম হচ্ছে। তার বদলে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত একটা উল্লাস অনুভব করছি। হঠাৎ ভীষণভাবে দুলে উঠল মেশিন, জানি না কী কারণে। বস্তুত এসব খেয়াল করার মত মনের অবস্থা নেই তখন। পাগলামির একটা ভূত চেপেছে যেন ঘাড়ে। বিদ্যুদবেগে ছুটে চলেছি ভবিষ্যতের দিকে। ভেতরে জন্ম নেয়া নতুন চাঞ্চল্যটুকু ছাড়া থামা বা অন্য কোন কিছুরই আর চিন্তা করছি না আমি।

'ধীরে ধীরে নতুন আরও অনুভূতি এসে ভিড় করল মনে। কিসের যেন কৌতূহল, আবার কিসের যেন একটা ভয়। আমার সামনে ধাবমান নিষ্প্রভ পৃথিবী। যখন চোখের সামনে দেখতে পাব আমাদের লুপ্তপ্রায় সভ্যতার রূপ, আগামী পুরুষদের, কেমন লাগবে! সুবিশাল, অতি চমৎকার সব স্থাপত্যের কুয়াশাচ্ছন্ন আভাস পেলাম। আমাদের এখনকার যে-কোনও বিল্ডিংয়ের চেয়ে

অনেক বড়ো। পাহাড়ের চারপাশে সবুজের সমারোহ। সারা বছরই সবুজ থাকছে। শীত আসছে না এখানে। বুঝলাম, ভবিষ্যতের পৃথিবী সম্বন্ধে আমার ভয় অমূলক। বড়ো মনোরম লাগছে এই পরিবেশ। সুতরাং থামার চিন্তা।

'থেমে পড়ার ব্যাপারে অদ্ভুত কিছু ঝুঁকি আছে। সময়ের ভেতর দিয়ে ছুটে চলার সময় মেশিন বা আমি কোন পদার্থের ভেতর থাকতে পারি। সময়ের মাঝ দিয়ে অতি দ্রুত বেগে ছুটে চলার সময় এটা কোন ব্যাপার নয়। কঠিন ঘন সন্নিবিষ্ট বস্তুর ভেতর দিয়েও আমি তখন বাষ্পের মত সূক্ষ্ম ভাবে পার হয়ে যেতে পারি! কিন্তু হঠাৎ থামলে আমার অণু-পরমাণু এসব বস্তুর মধ্যে আটকে যেতে পারে। অর্থাৎ, বাধা পেতে পারে এমন সব কঠিন বস্তুর ভেতরে আটকে যেতে পারে আমার চূর্ণিত দেহ। এতে এমন অদ্ভুত কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে যা ঘটাবে এক ভীষণ বিস্ফোরণ। সেই বিস্ফোরণে আমার মেশিন এবং আমি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে সমস্ত ডাইমেনশনের বাইরে এক অজানা জগতে চলে যেতে পারি। মেশিনটা তৈরি করার সময়েও এসব ভয় আমার মনে এসেছিল। যাই হোক এক সময় সমস্ত ভয় ঝেড়ে ফেললাম। ভাবলাম, এটা এক অবশ্যম্ভাবী ঝুঁকি। আর মানুষকে তো ঝুঁকি নিতেই হয়। এ-ঝুঁকি না নিয়ে কোন উপায় নেই আমার। সিদ্ধান্তটা নিয়ে আনন্দ পেলাম বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকল না এই আনন্দ। আসলে মেশিনের কর্কশ শব্দ, দোলা, অদ্ভুত অদ্ভুত সব দৃশ্য, সর্বোপরি সেই মাথা নিচু করে পড়তে থাকার অনুভূতি, সব মিলিয়ে আমার মানসিক বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল। একবার মনে হলো, কখনও থামতে পারব না। সঙ্গে সঙ্গে বদমেজাজ ভর করল। আমাকে থামতে হবে। এখুনি। এই মুহূর্তে। সংযম হারিয়ে হ্যাঁচকা টান দিলাম লিভারে। বোঁ করে ঘুরে গেল মেশিন। মাথা নিচু করে তীব্র বেগে যেন নিক্ষিপ্ত হলাম শূন্যে।

'বজ্রপাতের শব্দে কানে তালা লেগে গেল। কিছুক্ষণের জন্যে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। চারপাশে তুমুল শিলা বৃষ্টি হচ্ছে। মেশিনের সামনে, নরম ঘাসে বসে আছি আমি এখন সবকিছুই ধূসর। তবে কানের বিভ্রান্তিটা গেছে। চারপাশে তাকালাম। মনে হলো, একটা বাগানের ছোট লনে বসে আছি। চারদিকে রডোডেনড্রন ঝোপ। সেগুলোর গাঢ় লাল, বেগুনি ফুলের রাশি ঝরে ঝরে পড়ছে শিলাবৃষ্টির ঘায়ে। বৃষ্টিটা এক টুকরো মেঘের আকারে ঝুলে রইল মেশিনের ওপর তারপর ধোঁয়ার মত চলে গেল মাটির ওপর দিয়ে। দেখতে দেখতে ভিজে কাক হয়ে গেলাম। "যে-মানুষটা অসংখ্য বছর পেরিয়ে তোমাদের দেখতে এল, তার প্রতি বেশ ব্যবহার তো," বললাম আমি।

'ভাবলাম, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোকার মত ভেজাটা ঠিক হলো না। আশেপাশে তাকালাম আবার। ঝাপসা বৃষ্টির পর্দা ভেদ করে রডোডেনড্রন ঝোপের ওপারে চোখ পড়ল। শাদা পাথরের অতিকায় একটা মূর্তি দেখা যাচ্ছে। মরীচিকা? ওটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

'যতই উপমা দিই, আমার ওই অনুভূতি কাউকে বোঝানো সম্ভব নয়। বৃষ্টির ধারা একটু কমতে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ভাবে দেখতে পেলাম শাদা মূর্তিটাকে। খুবই বড়ো মূর্তিটা। একটা সিলভার বার্চ গাছ ওটার কাঁধ ছুঁয়েছে মাত্র। শাদা

মার্বেল পাথরে তৈরি মূর্তিটা যেন পাখাঅলা স্ফিংক্স। কিন্তু পাখাগুলো খাড়াভাবে নেই। দু'পাশে ছড়ানো, যেন ভেসে আছে বাতাসে। বেদীটা মনে হলো ব্রোঞ্জের, পুরু হয়ে গেছে তাম্রমলে। মনে হলো এদিকেই চেয়ে আছে মূর্তিটা। অপলক চোখে দেখছে আমাকে। ঠোঁটে হালকা হাসির আভাস। কাল ছোবল মেরেছে মূর্তিটার সর্বাঙ্গে। যেন কোন অসুখের অস্বস্তিকর সংবাদ বহন করছে। কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম জানি না– আধমিনিট নাকি আধঘণ্টা। বৃষ্টি বাড়ালে মনে হলো, বুঝি এগিয়ে এল মূর্তিটা। আবার কমলে মনে হলো, পিছিয়ে গেল। অবশেষে চোখ ফেরালাম ওদিক থেকে। টুপটাপ দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। আলো ফুটছে আকাশে। সূর্য উঠবে মনে হয়।

'আবার তাকালাম গুড়ি মেরে থাকা শাদা মূর্তিটার দিকে। হঠাৎ মনে হলো আমার সমস্ত যাত্রাটা এক হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সামনের কুয়াশাচ্ছন্ন পর্দাটা সরে গেলে কি দেখব? নিষ্ঠুরতা যদি এখন স্বাভাবিক ব্যবহারের অঙ্গ হয়ে যায়? এতদিনে মানুষ যদি হারিয়ে ফেলে তার মনুষ্যত্ব? যদি হয় অসহানুভূতিশীল, বর্বর, অদম্য শক্তিশালী এক জীব? অতীত পৃথিবীর সেই হিংস্র, কুৎসিত প্রাণীদের কথা মনে হলো। যা ভাবছি তাই যদি হয়, তাহলে তো এদের নির্দ্বিধায় হত্যা করা উচিত হবে।

'আরও জিনিস চোখে পড়ল। বিরাট বিরাট থাম, প্যারাপেটসহ বিশাল সব বিল্ডিং। বন জঙ্গল ভর্তি একটা পাহাড় ঝড়ের মাঝ দিয়ে যেন এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আতঙ্কে কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেল আমার। পাগলের মত ছুটে গেলাম টাইম মেশিনের দিকে। আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম আবার চালু করার জন্যে। এই সময় ঝড়-বৃষ্টি ভেদ করে ঝিকমিকিয়ে হেসে উঠল সূর্যের আলো ভুতুড়ে জামার মত সরে গেল ঝড়ের ধূসর পর্দা। অনেক ওপরে, গ্রীষ্মের নীল আকাশে হালকা বাদামী কিছু মেঘ অসীম শূন্যতায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এবার পরিষ্কার দেখতে পেলাম বিল্ডিংগুলো। বৃষ্টিতে গোসল করে ঝকঝক করছে। অজানা, অদ্ভুত এক পৃথিবীতে আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি ন্যাংটো হয়ে। একা। ভীষণ একা। নিরীহ পাখি উড়তে উড়তে যখন বাজ দেখে বুঝতে পারে শোঁ করে নেমে এসে আক্রমণ করবে যে-কোন মুহূর্তে তখন তার যেমন অবস্থা হয়, তেমনি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম আমি। দাঁতে দাঁত চেপে আবার টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করলাম মেশিনের যন্ত্রপাতি নিয়ে। মরিয়া হয়ে টানাটানি করতে করতে মেশিনটা হঠাৎ ঘুরে এসে ভীষণ আঘাত হানল আমার চোয়ালে। এক হাত বসার গদির ওপর, আরেক হাত লিভারে রেখে হাপরের মত হাঁপাতে লাগলাম। মেশিনে আবার উঠে বসার ইচ্ছে তখনও ছাড়িনি।

'তাড়াতাড়ি ফিরতে পারব চিন্তা করে সাহস কিছুটা ফিরে এল আমার। কৌতূহলী চোখে তাকালাম সুদূর ভবিষ্যতের পৃথিবীর দিকে। হঠাৎ চোখে পড়ল, কাছাকাছি একটা বাড়ির গোল খোলা ছাদে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। নরম, দামী লম্বা পোশাক তাদের পরনে। তাকিয়ে আছে আমার দিকেই।

'মানুষের গলাও শুনতে পেলাম। শাদা স্ফিংক্সের আশেপাশের ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে লোকজন ছুটে আসছে। যে-লনে মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছি

সেখানে এসে পড়ল একজন। ছোটখাটো, চারফুটের মত লম্বা একটা লোক। রক্তলাল একটা টিউনিক গায়ে। কোমরে চামড়ার বেল্ট। পায়ে স্যাণ্ডেল নাকি বাসকিন ঠিক বুঝতে পারলাম না। হাঁটুর নিচ থেকে খোলা পা। মাথাতেও নেই কিছুই এই প্রথম খেয়াল করলাম, এখানে আবহাওয়া বেশ উষ্ণ।

'লোকটা দেখতে খুবই সুন্দর কিন্তু শরীরের গঠন দেখে মনে হয় ভীষণ দুর্বল তার লাল টকটকে মুখ দেখে মনে হলো, এটাই বোধহয় সেই ধরনের সৌন্দর্য, যার কথা অনেক শুনেছি আমরা কিন্তু চোখে দেখিনি কখনও। হঠাৎ করেই সমস্ত শক্তি, ভরসা ফিরে পেলাম। হাত সরিয়ে নিলাম মেশিন থেকে।'

পাঁচ

স্বর্ণযুগে

'আমি আর সুদূর ভবিষ্যতের সেই মানুষটা মুখোমুখি হলাম। সরাসরি আমার দিকে চেয়ে হাসল সে। মোটেও ভয় পেল না দেখে খুব আশ্চর্য হলাম। তার পিছু পিছু আসা অন্য দু'জনের দিকে চাইল সে খুব মিষ্টি, নরম গলায় কথা বলল অদ্ভুত এক ভাষায়।

'আরো কয়েকজন এল সবসুদ্ধ অপূর্ব সুন্দর এই খুদে লোকদের আট দশজন আমার চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল। একজন কী যেন বলল আমাকে। কথা বলতে চেয়েও বললাম না। আমার কণ্ঠ তাদের কানে নিশ্চয় খুবই কর্কশ ঠেকবে। মাথা ঝাঁকালাম দু'কানের দিকে হাত দেখিয়ে মাথা নাড়লাম আবার। এক পা এগিয়ে এল সে। একটু ইতস্তত করে আমার হাত ছুঁলো। পেছনে, কাঁধের কাছেও খুব নরম একটা স্পর্শ পেলাম। ওরা দেখছে, আমি আসলেই মানুষ নাকি অন্য কিছু। বুঝলাম, ওদের কার্যকলাপে ভয় পাবার মত কিছুই নেই। ছোটোখাটো এই মানুষদের মাঝে যেন ছড়িয়ে আছে আত্মবিশ্বাস। চমৎকার ভদ্রতা। আর শিশুর সরলতা। এ-ছাড়াও, তারা এতই দুর্বল, ডজনখানেককে ধরে ছুঁড়ে ফেলতে পারি আমি অনায়াসেই হঠাৎ এমন একটা ভঙ্গি করলাম যাতে ভয় পায় ওরা। কিন্তু এদিকে আর নজর নেই তাদের। ছোট্ট গোলাপী হাতে টাইম মেশিনটা নেড়েচেড়ে দেখছে। হায়, হায়! তবু ভাল যে সময় থাকতেই চোখে পড়েছিল। কী বিপদই না ঘটে যেতে পারত। তাড়াতাড়ি গরাদের ওপর ঝুঁকে পড়ে স্ক্রু খুলে ছোট লিভার দুটো আলগা করে রেখে দিলাম পকেটে এবার চিন্তা, ওদের সাথে ভাব বিনিময়ের কী ব্যবস্থা করা যায়।

'ড্রেসডেনের চিনামাটির জিনিসপত্রের মত মনোরম এরা। কিন্তু তার মধ্যেও কিছু বিসদৃশ ব্যাপার চোখে পড়ল আমার। সবারই চুল কোঁকড়া। নেমে গেছে গলে এবং ঘাড়ের কাছাকাছি। কিন্তু চুলের ডগাগুলো ছুঁচলো। সারা মুখের কোথাও চুলের লেশমাত্র নেই। কান দুটো অস্বাভাবিকরকম ছোট। লাল টকটকে ছোট ছোট মুখ। খুব পাতলা ঠোঁট, তীক্ষ্ণ চিবুক। বড়ো বড়ো কোমল চোখ। আর– আমি

এখনও ভাবছি, ওদের মধ্যে কৌতূহলের অভাব আছে। অবশ্য মনে হতে পারে আমি ইগোর বশবর্তী হয়ে এ-চিন্তা করেছি।

'তারা যোগাযোগের কোন চেষ্টাই করল না আমার সঙ্গে চারপাশে দাঁড়িয়ে খালি হাসল আর ফিসফিস করে চলল সেই পাখির মত অপূর্ব নরম গলায় কাজেই শুরুটা আমাকেই করতে হলো। প্রথমে টাইম মেশিনের দিকে হাত দিয়ে দেখালাম। তারপর আমার দিকে। সময়ের কথা বলব কেমন করে ভেবে খানিক দ্বিধা করলাম। তারপর আঙুল তুললাম সূর্যের দিকে। গাঢ় লাল আর শাদা চেক কাপড় পরা একজন খেয়াল করল আমার এই ভঙ্গি। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর তীক্ষ্ণ এক আওয়াজ করল বজ্রপাতের অনুকরণে। আমি হতবাক

'তার সঙ্কেত পানির মতই সহজ। কিন্তু অত্যন্ত তীব্র সেই শব্দ আমাকে কিছুটা হতভম্ব করে দিল। তৎক্ষণাৎ মাথায় চিন্তা ঢুকল, বোকার হদ্দ নাকি এরা? তখন আমার কেমন লেগেছিল বোঝানো খুব কঠিন। আমার স্বতঃসিদ্ধ ধারণা ছিল আট লক্ষ দু'হাজার খ্রীস্টাব্দের লোকেরা বিদ্যা, বুদ্ধি, সংস্কৃতিতে আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত হবে। কিন্তু যে-প্রশ্নটা আমাকে করা হলো তা আমাদের যুগের পাঁচ বছরের কোন শিশুর পক্ষে সাজে। প্রশ্নটা হলো, সূর্য থেকে বজ্রপাতের মাধ্যমে আমি এখানে এসেছি কিনা। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, দুর্বল হাত-পা, পলকা দেহ দেখে যা ভেবেছি সব মিথ্যে হয়ে গেল। বৃথাই তৈরি করেছি টাইম মেশিন, এ-কথাও মনে হলো একবার।

'ঝুঁকে আবার নির্দেশ করলাম সূর্যের দিকে। তারপর এমন জোরে শব্দ করলাম বজ্রপাতের মত, চমকে উঠল ওরা দু'এক পা পিছিয়ে গেল সবাই। মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাল তারপর হাসতে হাসতে এগিয়ে এল একজন জীবনে কোনদিন দেখিনি এমন এক ফুলের মালা তার হাতে আমার গলায় পরিয়ে দিল সেই মালা। ব্যাপারটা খুব পছন্দ হয়েছে, এমনভাবে কলধ্বনি করে উঠল সবাই। এদিক-সেদিক দৌড়ে ফুল নিয়ে এল। ছুঁড়তে লাগল আমার দিকে দেখতে দেখতে ফুলের নিচে প্রায় ডুবে গেলাম আমি যুগ-যুগান্তের সভ্যতাসমৃদ্ধ সেই ফুলের সৌন্দর্য, না দেখলে কোন ধারণাই করা সম্ভব নয়। কে যেন একজন বলল কাছের বিল্ডিংটার সামনে গিয়েও এই মজা করা উচিত। পরস্পর সমকোণে অবস্থিত পাথরের চমৎকার কারুকার্য করা এক বিশাল বিল্ডিংয়ের দিকে আমাকে নিয়ে চলল ওরা শাদা মার্বেলের স্ফিংক্সের পাশ দিয়ে আমার বিস্ময় দেখে যেন সবসময় ঠোঁট টিপে হাসছে স্ফিংক্স। উত্তরপুরুষদের গূঢ়, গভীর জ্ঞান সম্বন্ধে আমার স্বতঃসিদ্ধ ধারণার কথা মনে পড়ল আবার। অদম্য এক পুলকে ভরে গেল মন।

'বিশাল প্রবেশ পথ দালানটার ওটার সবকিছুই বিশাল। আমার চারপাশ ঘিরে সেই খুদে মানুষের দল। সামনে ছায়া-ঢাকা রহস্যময় জংকালো অতিকায় এক তোরণ মুখ ব্যাদান করে আছে। ওদের মাথার ওপর দিয়ে দেখা গেল জট পাকানো ঝোপঝাড়, ফুল-লতাপাতা আর দীর্ঘদিনের অবহেলিত এক বাগান অনেক দিন হাত না পড়া সত্ত্বেও কোন আগাছা বা বুনো লতাপাতা নেই লম্বা লম্বা শাদা অদ্ভুত এক জাতের ফুল দেখলাম। এক ফুট মত চওড়া হবে ফুলগুলো

মোমের মত নরম পাপড়ি। বিভিন্ন রঙের ছোপওয়ালা ঝোপে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ফুটেছে ফুলগুলো বুনো ফুলের মত। অবশ্য খুব ভালভাবে কাছ থেকে দেখতে পারিনি ফুলগুলোকে। রডোডেনড্রন ঝোপগুলোর মাঝখানে তৃণাচ্ছাদিত ফাঁকা জায়গায় পড়ে আছে টাইম মেশিনটা।

চমৎকার ভাস্কর্য তোরণের খিলানে। কাছে থেকে দেখা না গেলেও, মনে হলো, ওগুলো পুরানো ফিনিশীয় কারুকার্য। জায়গায় জায়গায় ভাঙা, কালের ছোবলে জীর্ণ অবস্থা দেখে খারাপ লাগল। দরজার কাছে নতুন, ঝকঝকে পোশাক পরা অনেক লোক মিলিত হলো আমার সঙ্গে। ভেতরে ঢুকলাম। আমার গায়ে উনবিংশ শতাব্দীর কালচে রঙের নিষ্প্রভ পোশাক, তার ওপর ফুলের বোঝা। সে এক অদ্ভুত মূর্তি। চারপাশের ঝকমকে চোখ-জুড়ানো রঙের পোশাক-পরিচ্ছদ, শাদা ধবধবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সুললিত হাসি আর সহাস্য কথার ঘূর্ণিতে আমি যেন হারিয়ে গেলাম।

'বিশাল দরজার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটা বাদামী হলঘর। ছাতটা ছায়ায় ঢাকা। জানালার কোন কোন জায়গায় রঙিন কাচ। ফলে কিছু অংশ জ্বলজ্বল করছে, কিছু অংশ করছে না। দুয়ে মিলে এক পরিমিত আলোর সৃষ্টি করেছে। খুব শক্ত, শাদা কী যেন ধাতুর বিশাল বিশাল ব্লক দিয়ে তৈরি মেঝে। প্লেট বা প্যাব নয়। জীর্ণ হয়েছে মেঝেও। চকচকে পাথরের প্যাব দিয়ে তৈরি অনেকগুলো টেবিল রাখা আছে আড়াআড়িভাবে। মেঝে থেকে ফুটখানেক মত উচু টেবিলগুলো। সবগুলোই ফলে বোঝাই। কিছু ফল দেখে মনে হলো, অত্যন্ত উন্নতজাতের রাসবেরি আর কমলা। বেশির ভাগই চিনলাম না

'টেবিলের ফাঁকে ফাঁকে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে অনেক কুশন। ছোটখাটো মানুষগুলো বসে পড়ল কুশনে। আমাকেও বসতে বলল ইশারায়। দু'হাতে ফল খেতে লাগল ওরা। খোসা, বোঁটা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল টেবিলের পাশে ফাঁকা গোল জায়গায়। আমার পিপাসা, খিদে দুটোই পেয়েছিল। খেয়ে-দেয়ে ধীরে সুস্থে দেখতে লাগলাম হলঘরটা।

'প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হলঘরটা দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। দাগপড়া কাচের জানালাগুলোর অনেক জায়গা ভাঙা। পর্দার নিচের দিকটা ধুলোয় ভর্তি। কাছেই মার্বেল পাথরের একটা ভাঙা টেবিল। তবু সব মিলিয়ে অভিজাত, ছবির মত একটা সৌন্দর্য আছে ঘরটার। শ'দুয়েক লোক খাচ্ছে একসঙ্গে। আমাকে ভালভাবে খেয়াল করার জন্যে যে যতটা পারে কাছে বসেছে। জ্বলজ্বল করে জ্বলছে ওদের ছোট ছোট চোখ। নরম অথচ টেকসই সিল্কের মত পোশাক সবার পরনে।

'তাদের একমাত্র খাবার হলো ফল। সুদূর ভবিষ্যতের এই মানুষেরা পুরোপুরি নিরামিষভোজী আমিষ খাবার জন্যে মনটা আকুলি-বিকুলি করছে আমার। কিন্তু ওদের সঙ্গে আছি যখন, সে-আশা বাদ দিয়ে আমাকেও হতে হলো ফলমূলভোজী ইচথিওসরাসের মত লোপ পেয়েছে ঘোড়া, গরু, মোষ, ভেড়া আর কুকুরও। ফলগুলো অবশ্য চমৎকার বিশেষ করে তিনকোনা খোসাঅলা, ময়দার গুড়ো মাখা চেহারার একটা ফল অপূর্ব লাগল ওটাকেই প্রধান খাদ্য হিসেবে

নির্বাচন করলাম। অদ্ভুত অদ্ভুত সব ফলমূল দেখে প্রথমে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। আস্তে আস্তে উপলব্ধি করতে লাগলাম সেগুলোর স্বাদগন্ধ।

'যাই হোক, আপনাদের বলছিলাম সুদূর ভবিষ্যতের ফলের ডিনারের কথা। পেট কিছুটা ভরতেই ঠিক করলাম, এইসব লোকজনদের ভাষা যেমন করেই হোক শিখতে হবে। হ্যাঁ, এটাই হবে আমার প্রথম কাজ। ফল খুব সুবিধাজনক মাধ্যম হতে পারে। একটা ফল ওপরে তুলে ধরে নানারকম প্রশ্নবোধক শব্দ ও অঙ্গভঙ্গি করতে লাগলাম। অসুবিধে হলো এই, কী বলছি তার অর্থ বোঝানর কোন উপায় আমার জানা নেই। প্রথমে আমার ভাবভঙ্গি দেখে কেউ কেউ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল। আবার কেউ কেউ ফেটে পড়ল হাসিতে। পরে সুন্দর চুলঅলা একজন লোক মনে হয় বুঝতে পারল আমার মনোভাব। কী যেন একটা নাম বারবার উচ্চারণ করে চলল সে। নিজেদের মধ্যে কিচির মিচির করে আলাপ-আলোচনা করছে ওরা। আমি যে ওদের ভাষা বোঝার চেষ্টা করছি, এটা ওদের মধ্যে কিছুটা অশোভন কিন্তু সত্যিকারের কৌতুকের জন্ম দিয়েছে। আমার অবস্থা হলো একদল শিশুর মাঝে স্কুল মাস্টারের মত– এদের মানুষ করার অধ্যবসায় চালাচ্ছি। অন্তত কিছু বস্তুবাচক বিশেষ্য জানা হলো আমার। নির্দেশ করার মত কিছু সর্বনাম। এমন কি ক্রিয়াপদও, যেমন– খাওয়া। কাজটা খুব সময় সাপেক্ষ। ছোট মানুষগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ল খুব তাড়াতাড়িই। পালাতে চাইল আমার প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচার জন্যে। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞায় অটল, ওদের ভাষা আমাকে শিখতে হবেই। নিজের গরজেই শিখতে হবে। তবে একবারে নয়। শিখতে হবে আস্তে আস্তে। অল্প অল্প করে। খুবই অল্প অল্প করে, কারণ, এরকম পরিশ্রম-বিমুখ, একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়া মানুষ আর জীবনে দেখিনি।'

ছয়

মানব সভ্যতার অন্তলগ্ন

আমার খুদে হোস্টদের একটা অদ্ভুত অভ্যাস আবিষ্কার করলাম। কোন কিছুতেই খুব একটা কৌতূহল নেই তাদের। প্রথমে আমাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কাছে এসেছিল সত্যি কিন্তু সেটা শিশুদের বিস্ময় বা কৌতূহলের মত। শিশুরা একটা খেলনা পেলে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে। কিন্তু নতুন আরেকটা খেলনা পাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমটার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। এরাও তেমনি খুব তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল আমার দিক থেকে। ডিনার আর ভাব বিনিময়ের প্রথম অধ্যায় শেষ হলো। সবচেয়ে আগে যে ক'জন আমার কাছে গিয়েছিল তাদের প্রায় সবাই চলে গেছে, এই প্রথম ব্যাপারটা চোখে পড়ল আমার। চিন্তা করতেও খারাপ লাগে, কত তাড়াতাড়ি এদের সম্বন্ধে অবজ্ঞা এসে গেল মনে। সেই তোরণের ভেতর দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম সূর্যকরোজ্জ্বল পৃথিবীতে। আরও কিছু লোকের সঙ্গে দেখা হলো এখানে-সেখানে। আমাকে দেখে ওরা নিচু

গলায় কথা বলছে। হাসছে। অঙ্গভঙ্গিও করছে শালীনতা বজায় রেখে। তারপর চলে যাচ্ছে যে যার পথে।

'বড়ো হলঘরটা থেকে যখন বেরোই, পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে সন্ধ্যার আভাস। পড়ন্ত সূর্যালোকে চমৎকার লাগছে সবকিছু। তবে যা দেখছি, সবই কেমন যেন বিভ্রান্তিকর। আমার চেনা পৃথিবীর সঙ্গে এখনকার প্রতিটি জিনিসের কী পার্থক্য, এমন কি ফুলেরও। যে বিরাট বিল্ডিংয়ে এতক্ষণ কাটালাম, সেটা একটা নদীর ঢালের ওপর অবস্থিত। টেমস্ নদী। বর্তমান অবস্থান থেকে মাইলখানেক সরে গেছে। মাইল দেড়েক দূরের একটা পাহাড়ের চুড়োয় উঠব বলে ঠিক করলাম। এতদিন পর কেমন হয়েছে আমাদের গ্রহের অবস্থা, ভালভাবে দেখা দরকার। টাইম মেশিনের খুদে ডায়ালে সময়ের হিসেব উঠেছে। এখন আট লক্ষ দু'হাজার সাতশো এক খ্রীস্টাব্দ।

'হাঁটতে হাঁটতে প্রত্যেকটা জিনিস তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করলাম। ভাঙাচোরা এই পৃথিবীর ধ্বংসপ্রাপ্ত জাঁকজমকের যদি কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। পাহাড়ে কিছুটা উঠতে গ্রানিট আর অ্যালুমিনিয়ামের বিশাল স্তূপ দেখা গেল পাশাপাশি। ছোট ছোট স্তূপ আর খাড়া খাড়া দেয়ালে ভর্তি গোলকধাঁধার মত একটা জায়গা। তার ফাঁকে ফাঁকে প্যাগোডা আকৃতির খুব সুন্দর কিছু গাছপালা। বিছুটি হতে পারে। পাতায় চমৎকার বাদামী রঙের ছোপ। কাঁটা নেই। এটা নিশ্চয় বিশাল কোন বিল্ডিংয়ের পরিত্যক্ত অংশ। তবে কবে নির্মিত হয়েছিল এই বিল্ডিং বোঝা গেল না।

'একটা টেরেসে বসে বিশ্রাম নিতে নিতে চারদিকে নজর বুলালাম। ছোটখাটো কোন বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ছোট বাড়ি উধাও হয়ে গেছে এই কাল থেকে এদিক-সেদিক শ্যামলিমার ফাঁকে ফাঁকে প্রাসাদোপম অট্টালিকা। আমাদের চিরপরিচিত বাড়ি বা কুটিরের চিহ্নমাত্র নেই।

' ''কম্যুনিজম''. আপন মনেই বললাম।

'কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে একই সূত্রে আরেকটা চিন্তা এল মাথায়। জনাছয়েক লোক এসেছে আমার পিছু পিছু। হঠাৎ করেই লক্ষ করলাম, তাদের সবার একই ধরনের পোশাক, লোমবিহীন একই রকম মুখমণ্ডল আর নারীসুলভ গোলগাল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। খুব অবাক ব্যাপার, এতক্ষণ জিনিসটা আমার নজরে পড়েনি। সবকিছুই অবাক করা। তবে এখন জিনিসটা বুঝতে পারছি ভালভাবেই। কাপড়-চোপড়, নারী-পুরুষ ভেদে অঙ্গবিন্যাস, যৌনাঙ্গের পার্থক্য সত্ত্বেও ভবিষ্যতের এই মানুষেরা সবাই প্রায় একরকম। ছেলেমেয়েরা তাদের পিতামাতার খুদে সংস্করণ মাত্র। পরে প্রমাণ পেয়েছি, ছেলেমেয়েরা ভীষণ অকালপক্ব। অন্তত শরীরের দিক থেকে তো বটেই।

'খুব আয়েশী, নিরাপদ জীবন যাপন করছে এরা। নারী-পুরুষের এতটা সাদৃশ্য এসেছে আসলে মানুষের ইচ্ছের পথ ধরেই। পুরুষের শক্তি, মেয়েদের কোমলতা, পরিবারের নিয়মকানুন, জীবিকার প্রকারভেদ সবই দৈহিক শক্তির এক সংগ্রামশীল যুগের প্রয়োজনীয়তা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেখানে হিংস্রতা নেই বললেই চলে, ভবিষ্যতের বংশধরেরা যেখানে নিরাপদ, সেখানে এসবের প্রয়োজন

থাকবে কম। প্রয়োজন থাকবে না বললেই ঠিক বলা হয়। শিশুদের রক্ষা বা অন্যান্য যেসব প্রয়োজনে নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য দরকার, সেসব আপনা-আপনি চলে যাবে। আমাদের যুগেই এ-ধরনের ঘটনার সূত্রপাত দেখেছি। এখন ভবিষ্যতে দেখছি তার পূর্ণাঙ্গ রূপ। আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, কালবিষয়ক সুদূর কল্পনায় আমি এইসব চিত্রই দেখতাম। আমার কল্পনা যে প্রায় সত্যি, তা দেখে মনে মনে বেশ গর্ব বোধ করলাম।

'চিন্তা-ভাবনা করতে করতেই একটা গম্বুজের নিচে কুয়োমত ছোট সুন্দর একটা কাঠামো নজরে পড়ল আমার। চকিতে মনে হলো, কুয়ো জিনিসটা তাহলে এখনও আছে? প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফিরে গেলাম আগের ভাবনায়। পাহাড়ের মাথার দিকটায় বড়ো কোন দালান-টালান নেই। হাঁটতে আমার ক্লান্তি আসে না কখনও। সঙ্গে কেউ নেই। স্বাধীনতা আর দুঃসাহসের একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে মন ছেয়ে গেল। রওনা দিলাম চুড়ো অভিমুখে।

'হলুদ অচেনা কী এক ধাতুর তৈরি একটা চেয়ার পেলাম। জায়গায় জায়গায় মরচে ধরে ক্ষয়ে গেছে। অর্ধেক ঢেকে গেছে নরম শ্যাওলায়। হাতল দুটো তৈরি করা হয়েছে গ্রিফিনের[*] মাথার অনুকরণে। বসে পড়লাম চেয়ারে। সূর্য ডুবছে। তার নিচে ছড়ানো পুরানো পৃথিবীর বিরাট দৃশ্য। এমন মধুর ছবি খুব কমই দেখেছি জীবনে। দিকচক্রবালের নিচে নেমে গেছে সূর্য। গলানো সোনা ছড়ানো পশ্চিমের আকাশ। তার নিচে ময়ূরকণ্ঠী ও টকটকে লাল রঙের দিকচক্রবাল রেখা। টেমস্ উপত্যকার মাঝে চকচকে ইস্পাতের মত নদীটা। আগেই বলেছি, শ্যামশোভার ফাঁকে ফাঁকে বিশাল বিশাল সব অট্টালিকা। কোনটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কোনটাতে এখনও বাস করছে মানুষ। এদিকে-সেদিকে শাদা বা রূপালী গড়নের কি সব মাথা তুলে আছে। আবার কোথাও দেখা যাচ্ছে গম্বুজ বা ওপর দিকে সরু হয়ে যাওয়া চারকোনা স্তম্ভের সারি। কোন ঝোপজঙ্গল নেই। নেই মালিকানার অধিকার। কৃষিরও কোন চিহ্ন নেই কোথাও। গোটা পৃথিবী রূপান্তরিত হয়েছে বাগানে।

'মনে মনে ব্যাখ্যা চলছে সন্ধ্যায় দেখা দৃশ্যাবলীর। পরে জেনেছিলাম, আমার ব্যাখ্যার খুব কম অংশই সত্যি। বড়োজোর অর্ধেক।

'মনে হয়, মানবসভ্যতার একেবারে অস্তলগ্নে এসে পড়েছি। লালাভ সূর্যাস্ত আমায় মনে করিয়ে দিল মানবসভ্যতার সূর্যাস্তের কথা। এই প্রথম আমাদের বর্তমান সামাজিক প্রচেষ্টার পরিণতি বুঝতে লাগলাম সত্যি বলতে কি, যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য এক পরিণতি এটা। প্রয়োজন জন্ম দিয়েছে শক্তির দুর্বলতা থেকে এসেছে নিরাপত্তার চিন্তা। জীবনযাত্রার উন্নতি সাধনের চেষ্টা, জীবনকে নিরাপদ থেকে নিরাপদতর করার সত্যিকারের সভ্য প্রণালী খুব তাড়াতাড়িই একটা চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। একের পর এক প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করে গেছে মানুষ। পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষের স্বপ্ন ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। এবং শেষ পর্যন্ত কর্মফল পাওয়া গেছে কতখানি, সেটা তো নিজের চোখেই দেখলাম!

---

[*] মাথা ও পাখা ঈগলের, দেহটা সিংহের, এমন এক কল্পিত জীব

'বর্তমানে কৃষি ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। অসুখ-বিসুখের বিরুদ্ধে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি আজকের বিজ্ঞান। তবু রোগজয়ের অভিযান এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতেই। আমাদের কৃষি ও উদ্যানপালনবিদ্যা কী করছে? কিছু আগাছা ধ্বংস করছে। খাবারের জন্যে পুষ্টিকর এটা-ওটা আবাদ করছে। হাত দেয়া হচ্ছে না বেশির ভাগ উদ্ভিদেই। আপনাআপনি যতটুকু পারে ভারসাম্য রক্ষা করছে উদ্ভিদগুলো। শুধু আমাদের পছন্দসই উদ্ভিদ এবং পশুর প্রতি নজর দিচ্ছি আমরা। কিন্তু সে আর ক'টা? সাধারণত বাছাই করে বংশবৃদ্ধি করা হচ্ছে। এই যেমন, নতুন ধরনের উন্নতজাতের পীচ, বিচিছাড়া আঙুর, বেশি সুগন্ধযুক্ত বড়ো ফুল বা উন্নতজাতের কিছু গবাদি পশু। আমরা এগুলোর উন্নতি সাধন করি আস্তে আস্তে, কারণ আমাদের সব আদর্শ উদ্দেশ্যই ভাসাভাসা, সাময়িক। জ্ঞানও খুবই সীমাবদ্ধ। আমাদের জবরজঙ্গ হাতে পড়ে প্রকৃতিও যেন ঢিলে হয়ে পড়ে। তবে একদিন ভালভাবে সংগঠিত হবেই এসব। দিনে দিনে এগোবে সমৃদ্ধির পথে। ঘূর্ণিজল দেখে ভয় পাবে না মানুষ, তার ভেতর দিয়েই এগিয়ে যাবে। অতিক্রম করবে সমস্ত বাধা-বিপত্তি। বুদ্ধিমান হবে সারা পৃথিবীর মানুষ। হবে শিক্ষিত। সবাই কাজ করবে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে। গতি বাড়বে কাজকর্মের। এমনি করে প্রকৃতি একদিন করায়ত্ত হবে মানুষের। তখন বিচার-বিবেচনা করে প্রয়োজনমত পশুপাখি এবং খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করব আমরা।

'যেসব জিনিসের কথা বললাম, খুব ভালভাবে সেগুলোর একটা চিরকালীন বিধিব্যবস্থা হতেই হবে। তা-ই হয়েছে। বাতাস এখানে নির্মল। পৃথিবী ছত্রাক আর আগাছামুক্ত। সর্বত্র ফল আর সুন্দর সুগন্ধি ফুল। রকমারি প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে এদিক সেদিক। রোগ প্রতিরোধের জন্যে ওষুধের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়েছে অসুখ। যতদিন ছিলাম, কোন সংক্রামক রোগের আভাস চোখে পড়েনি আমার। এমন কি ক্ষয় বা পচনক্রিয়ার ওপর পর্যন্ত গভীর প্রভাব পড়েছে এইসব পরিবর্তনের ফলে। সে-কথা আপনাদের পরে বলব।

'সমাজব্যবস্থারও জয় হয়েছে। চমৎকার বাসস্থান পেয়েছে মানুষ। পরছে দামী দামী কাপড়-চোপড়। কোনরকম কঠোর পরিশ্রমও করছে না তারা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিবাদের চিহ্নমাত্র নেই, না সামাজিক ক্ষেত্রে না অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। যেসব প্রধান বাণিজ্যিক বিষয়ের ওপর আমাদের পৃথিবী নির্ভরশীল, যেমন, দোকানপাট, বিজ্ঞাপন বা যানবাহন, এসবের একটাও নেই এখন। সেই সোনালি সন্ধ্যায় স্বাভাবিকভাবেই একটা স্বর্গীয় সমাজের চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঠেকানর অসুবিধেগুলো দূর হয়েছে। বাড়ছে না আর জনসংখ্যা।

'কিন্তু এসব পরিবর্তনের সঙ্গে অপ্রতিরোধ্যভাবে জড়িয়ে আছে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানর ব্যাপারটা। জীববিজ্ঞান যদি ভুলের একটা পাহাড় না হয়, তাহলে মানুষের বুদ্ধি আর জীবনীশক্তির উৎস কী? কষ্ট আর স্বাধীনতা। এসবের ভেতর দিয়েই সক্ষম শক্তিশালী আর বুদ্ধিমানেরাই শুধু টিকে থাকে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় দুর্বলের। সক্ষম মানুষদের মৈত্রী, আত্মসংযম, ধৈর্য আর অটল সিদ্ধান্তের

পুরস্কার এই বিধিব্যবস্থা। পারিবারিক নিয়ম-কানুন, আবেগ, তীব্র ঈর্ষা, সন্তানের জন্যে ভালবাসা, পিতার আত্মত্যাগ, সবকিছুই তরুণদের আসন্ন ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে খুঁজে পেয়েছে যথার্থতা আর সমর্থন। এখন কথা হলো, কোথায় নিহিত সেই আসন্ন বিপদ? বিবাহসংক্রান্ত ঈর্ষা, হিংস্রতা, আবেগের প্রচণ্ডতা, অপ্রয়োজনীয় বস্তু, সুখের অন্তরায়, জীবিকার তাগিদে হিংসাত্মক কার্যকলাপ, এসবের . বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। ক্রমেই বাড়বে এ-প্রবণতা। এক পর্যায়ে লড়াইয়ের মাঝ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে নতুন মনোরম এক জীবনব্যবস্থা।

'মানুষের শারীরিক খর্বতা, বুদ্ধির স্বল্পতা আর প্রচুর ধ্বংসাবশেষ দেখে প্রাকৃতিক বিজয়ের ওপর বিশ্বাস বাড়ল আরও। কারণ যুদ্ধের পরে আসে শান্তি। মানুষ শক্তি, সক্রিয়তা আর বুদ্ধির আধার। তাদের প্রচুর জীবনীশক্তির সবটুকু তারা ব্যয় করেছে পরিবেশ বদলের জন্যে। সেই পরিবর্তিত পরিবেশের কার্যকারিতা টের পাওয়া যাচ্ছে এখন।

'নতুন পরিবেশে সত্যিকারের আরাম আর নিরাপত্তা পেয়ে মানুষের সার্বক্ষণিক সক্রিয়তা, অর্থাৎ, শক্তি ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হবে দুর্বলতায়। এমন কি আমাদের সময়েও দেখা যায়, যে-প্রবণতা, যে-কামনাকে মনে হয় জীবনযুদ্ধের জন্যে অপরিহার্য, কিছুদিন পরেই সেগুলোর ফুটো পয়সাও মূল্য থাকে না। শক্তির বড়াই, যুদ্ধংদেহি মনোভাব কোন কাজের কথা নয়। বরং সভ্য মানুষের জন্যে এসব বাধা স্বরূপ। সুনিয়ন্ত্রিত নিরাপদ অবস্থায় বুদ্ধি বা দৈহিক শক্তি কোনটারই দরকার হবে না। বুঝতে পারলাম, বছরের পর বছর শতাব্দীর পর শতাব্দী কোন যুদ্ধ বিগ্রহ, এমন কি হিংসাত্মক কোন কার্যকলাপ পর্যন্ত ঘটেনি, উপদ্রব থাকেনি বন্য পশুর, অসুখের, দরকার হয়নি প্রাণপাত পরিশ্রম। দুর্বলেরাও আর দুর্বল থাকেনি এ-রকম পরিবেশে, হয়েছে সবলের সমকক্ষ। বরং হয়তো একটু ওপরেই রয়েছে দুর্বলেরা, কারণ সক্রিয়তা ক্ষয় করেছে সবলদের– যে ক্ষয় পূরণের কোন পথ নেই। এখনকার যে বিধিব্যবস্থা, সেসব শুরুর আগেই, অর্থাৎ, যে-কর্মশক্তির আর কোন দাম নেই এখন, তারই শেষ ফসল যে এই চমৎকার বিল্ডিংগুলো সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিধিব্যবস্থাগুলো উন্নতিলাভ করে শেষ পর্যন্ত জন্ম দিয়েছে এই অফুরান শান্তির। কর্মহীন নিরাপদ জীবন মগ্ন হয়েছে শিল্পকলার চর্চায়, সেখান থেকে খোলামেলা যৌনতায়। তারপর ধীরে ধীরে এসেছে অসাড়তা। পরিশেষে ধ্বংস।

'শিল্পপ্রেরণাও শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে যায়। আমি তো দেখলাম তার মুমূর্ষু অবস্থা। ফুলে সজ্জিত হওয়া, নাচা, সূর্যালোকের নিচে গান গাওয়া– শিল্পকলার প্রেরণার অবশিষ্ট আছে মাত্র এটুকুই। ধীরে ধীরে ওই অবশিষ্ট অংশটুকুও দখল করে নেবে নিষ্ক্রিয়তা। যন্ত্রণা আর প্রয়োজনের যাঁতাকলে পিষে মরছি আমরা। ঘৃণিত সেই যাঁতাকল যেন ভেঙেছে এতদিনে!

'পুঞ্জীভূত সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, সহজ সরল এই ব্যাখ্যা দিয়ে তো উদ্ধার করলাম পৃথিবীর সব সমস্যা। আবিষ্কার করলাম অতি চমৎকার এই মানুষদের যাবতীয় গূঢ় রহস্য। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পন্থা এত সফল হয়েছে যে,

অপরিবর্তিত না থেকে ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে মানুষের সংখ্যা। পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষের রহস্যের এই হলো সমাধান। খুবই সরল আমার ব্যাখ্যা। আপাতদৃষ্টিতে সঠিক, অধিকাংশ ভুল মতবাদের মতই বাক্‌চাতুর্যে মনোহর।'

সাত

আকস্মিক দুর্ঘটনা

মানুষের পরিপূর্ণ বিজয়ের চিন্তায় আমার মন বিভোর। উত্তর-পূর্ব দিকে আলোর বন্যা বইয়ে দিয়ে উঠল পূর্ণিমার হলুদ চাঁদ। নিচের ছোট ছোট উজ্জ্বল জিনিসগুলোর নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। একটা পেঁচা উড়ে গেল চুপচাপ। রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে গা শিউরে উঠল আমার। এবার নামতে হয় পাহাড় থেকে। শোয়ার একটা জায়গা দেখা দরকার।

'যে-বিল্ডিং থেকে এসেছিলাম, খুঁজলাম সেটা। চাঁদের আলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ব্রোঞ্জের বেদী। তাঁর ওপরে দাঁড়িয়ে আছে শাদা স্ফিংক্স। সেই সিলভার বার্চ গাছ। ফ্যাকাসে আলোয় কালো দেখাচ্ছে জড়াজড়ি করা রডোডেনড্রন ঝোপগুলো। ছোট্ট লনটা। আবার তাকালাম লনের দিকে। অস্বস্তিকর এক সন্দেহে আমার এতক্ষণের আত্ম-প্রসাদের বারোটা বেজে গেল। "না," নিজেকে অভয় দিলাম, "ওটা সেই লন নয়।"

'কিন্তু আসলে সেই লনই ওটা কারণ, স্ফিংক্সের শাদা কুষ্ঠ রোগীর মত মুখ ওদিকেই ফেরানো। বুঝতে পারলাম, আমার সন্দেহ সত্যি। কী সন্দেহ করছিলাম, বলতে পারবেন? পারবেন না। টাইম মেশিনটা নেই।

'মুখের ওপর যেন চাবুক কশাল কেউ। নিজের পৃথিবীতে ফিরতে পারব না, এ-চিন্তা ভর করল মনে। অসহায়ভাবে থেকে যেতে হবে অদ্ভুত, নতুন এই ভবিষ্যতের পৃথিবীতে। চিন্তাটা মনে আসতেই চঞ্চল হয়ে উঠলাম। গলা টিপে ধরে শ্বাসরোধ করতে চাইল তীব্র আতঙ্ক। এরপরই তীব্র ভয়ে লাফিয়ে দৌড়ালাম ঢাল বেয়ে। পা পিছলে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম এক জায়গায়। কেটে গেল মুখ। রক্ত দেখার জন্যে এক মুহূর্তও নষ্ট করলাম না। লাফিয়ে উঠে দৌড়ালাম আবার। গাল, চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে উষ্ণ রক্ত। দৌড়াতে দৌড়াতে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে চললাম, "বোধহয় খানিকটা সরিয়ে নিয়ে গেছে ওরা মেশিনটা। ঢুকিয়ে রেখেছে ঝোপের নিচে।" যাই বলি, দৌড়ে চললাম প্রাণপণে। যতই প্রবোধ দিই মনকে, ভীষণ ভয় ভর করল থেকে থেকেই। বুঝলাম, নিজেকে এই সান্ত্বনা দেয়া মূর্খতারই নামান্তর। মেশিনটা এখন আমার আয়ত্তের বাইরে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। পাহাড়ের চুড়ো থেকে লন পর্যন্ত মাইল দুয়েক রাস্তা বোধহয় পার হয়েছি মিনিট দশেকের মধ্যে। মেশিনটা ছেড়ে যাবার জন্যে চিৎকার করে অভিশাপ দিলাম নিজেকেই। আরও কিছুটা বেরিয়ে গেল দম। জোরে চিৎকার করলাম। উত্তর দিল না কেউ। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত সেই পৃথিবীতে একটা জীবও দেখা

গেল না কোথাও।

'লনে এসে দেখি, অমূলক ভয় করিনি আমি। কোথাও দেখা যাচ্ছে না টাইম মেশিন। ঝোপঝাড়ের মাঝেও পাওয়া গেল না যখন, ভয়ে শিউরে উঠলাম। মনে হলো একবিন্দু শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই শরীরে। মাথার চুল দু'হাতে খামচে ধরে এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে পাগলের মত ছুটে বেড়াতে লাগলাম। মনে আশা, কোন না কোন ঝোপের আড়ালে আছেই মেশিনটা। আমার সামনে চাঁদের আলোয় ব্রোঞ্জের বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে আছে স্ফিংক্স। শাদা। ঝকঝকে। কুষ্ঠরোগীর মত আমার আতঙ্কে বিদ্রূপের হাসি যেন তার চাপা ঠোঁটে।

'ছোটখাটো মানুষগুলোর অপর্যাপ্ত শারীরিক এবং মানসিক ক্ষমতার কথা জানা না থাকলে মনকে সান্ত্বনা দেয়া যেত, আমার জন্যেই ভাল কোন জায়গায় ওরা নিয়ে গিয়েছে মেশিনটা। আমার আতঙ্কটা ওখানেই। অজানা কোন এক শক্তির হস্তক্ষেপে উধাও হয়ে গেছে আমার আবিষ্কার। একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ আমি। আমার পরের কোন কালে যদি হুবহু এরকম টাইম মেশিন আবিষ্কৃত না হয়ে থাকে, তাহলে এটাকে চালানর সাধ্য কারও নেই। লিভার দুটো এমনভাবে লাগানো, একবার খুলে ফেললে ফের লাগানো প্রায় অসম্ভব। কায়দাটা পরে দেখাব আপনাদের তাহলে দেখা যাচ্ছে, মেশিনটা সরিয়ে বড়োজোর লুকিয়ে রেখেছে ওরা। কিন্তু কথা হলো, সেটা কোথায়?

'এক ধরনের উন্মত্ততা নিশ্চয় পেয়ে বসেছিল আমাকে। চাঁদের আলোয় স্ফিংক্সের চারপাশের ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ভীষণ ছুটোছুটি করেছিলাম, মনে আছে। ছোট ছোট শাদা কয়েকটা প্রাণী ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়েছিল। ভেবেছিলাম ছোট জাতের হরিণ হবে ওগুলো। গভীর রাতে দু'হাত মুঠিবদ্ধ করে ঝোপঝাড় ভেঙে দৌড়াতে গিয়ে কেটে ফালাফালা হয়ে গেল হাতের আঙুল। ছোট ছোট ভাঙা ডালে খোঁচা লেগে রক্ত ঝরতে লাগল। নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় বুজে এল গলা। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বকবক করলাম একা একাই। এগোলাম পাথরের বিশাল বিল্ডিংটার দিকে। বড়ো হলঘরটা অন্ধকার, ফাঁকা– টুঁ শব্দ নেই কোথাও। অমসৃণ মেঝেতে পা হড়কে দড়াম করে পড়লাম একটা মালাকাইট টেবিলের ওপর। অল্পের জন্যে ভাঙল না হাঁটুর নিচের হাড়। একটা দেশলাই জ্বালিয়ে ধূলিধূসরিত পর্দা পেরিয়ে গেলাম ওধারে।

'আরেকটা বড়ো হলঘর। চারদিকে কুশন ছড়ানো। তার ওপর জনাবিশেক খুদে মানুষ ঘুমোচ্ছে। রাগে বিড়বিড় করতে করতে নিস্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করে আমার এই দ্বিতীয় আবির্ভাব এবং দেশলাই জ্বালানো নিশ্চয় খুবই অবাক করেছিল ওদের। কারণ, দেশলাইয়ের ব্যবহার তারা ভুলে গেছে। "আমার টাইম মেশিন কোথায়?" রাগী শিশুর মত চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ঝাঁকাতে লাগলাম ওদের। আমার এরকম আচরণ যে তাদের খুব অদ্ভুত লাগল, এতে সন্দেহ নেই। কেউ হাসল। অধিকাংশই কাঠ হয়ে গেল ভয়ে। সবাই আমার চারপাশ ঘিরে দাঁড়াতে বুঝলাম, কী বোকার মত কাণ্ডই না করেছি এতক্ষণ ধরে।

'দেশলাই ছুঁড়ে ফেললাম। ঐকজন ছিটকে পড়ল আমার ধাক্কায়। ডাইনিং হলের ভেতর দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে বেরিয়ে এলাম চাঁদের আলোয়। আতঙ্কে

চিৎকার করতে করতে ছোটাছুটি করছে তারা ছোট ছোট পা ফেলে। চুপিসারে আকাশের আরও ওপরে উঠে পড়েছে চাঁদ। সব ঘটনা মনে নেই আমার। অপ্রত্যাশিতভাবে টাইম মেশিনটা হারিয়ে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। মানুষ যেন আর নেই আমি। হয়ে গেছি অজানা এক পৃথিবীর অদ্ভুত জানোয়ার। হৈ চৈ করে এদিক সেদিক দৌড়ালাম। চিৎকার করলাম ঈশ্বর আর ভাগ্যকে দোষী করে। অজানা সেই জায়গায় খুঁজে ফেরা, চাঁদের আলোয় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে হাতড়ে বেড়ানো, গাঢ় ছায়ায় বিচিত্র সব জীবের গায়ে হাত দেয়া– সব মনে আছে। শেষে স্ফিংক্সের কাছে, মাটিতে শুয়ে পড়লাম। চরম দুর্দশায় কেঁদে ফেললাম হু হু করে। বোকামি করে টাইম মেশিনটা ফেলে যাবার জন্যে নিজের ওপর যে প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল তা নেই আর। নিঃশেষ হয়ে গেছে শরীরের শক্তি। আছে শুধু দুর্দশা। তারপর কোন এক সময়ে এল ঘুম। জাগলাম যখন, তখন একেবারে দিন। ঘাসের ওপর, আমার চারধারে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে একজোড়া চড়ুই। হাত বাড়ালেই ধরা যাবে।

'উঠে বসলাম। স্মরণ করার চেষ্টা করলাম, কেমন করে গেলাম ওখানে। ভেতরে এত শূন্যতা আর হতাশাই বা কেন। ধীরে ধীরে মনে পড়ল সব। পরিষ্কার উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় বসে আমার অবস্থাটা পুরোপুরি বুঝতে পারলাম। গতরাতের ভয়ঙ্কর পাগলামির কথা মনে হলো। বিচারবুদ্ধি হারাইনি এখনও। আচ্ছা, সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটাই যদি ঘটে গিয়ে থাকে? হয়তো হারিয়ে গেছে মেনিশনটা। যদি ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকে? এ-চিন্তা করেই বুঝলাম, এখন আমার কর্তব্য শান্ত হয়ে ধৈর্য ধরা। জানতে হবে এখনকার মানুষের জীবনপ্রণালী। জানতে হবে কেমন করে হারাল মেশিনটা। তারপর জোগাড়ের ব্যবস্থা করতে হবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আর যন্ত্রপাতির। তাহলে হয়তো আরেকটা মেশিন তৈরি করতে পারব। এটাই আমার একমাত্র আশা। খুবই দুর্বল আশা সন্দেহ নেই, তবু হতাশার চেয়ে ভাল।

'হয়তো শুধু সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মেশিনটা। তবু, শান্ত হয়ে ধৈর্য ধরতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওটা। তারপর উদ্ধার করতে হবে গায়ের জোরে অথবা বুদ্ধি খাটিয়ে। হাঁটু গেড়ে বসে ভাবলাম, কোথায় গোসল করা যায়। ক্লান্তি লাগছে। পেশীগুলো যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। ধুলোয় গা বোঝাই। দিনের সজীবতায় আমারও তাজা হতে ইচ্ছে করছে। আবেগের লেশমাত্র আর নেই। সত্যি বলতে কি, হাঁটতে, হাঁটতে গতরাতের সাংঘাতিক উত্তেজনার কথা মনে করে বিস্মিতই হলাম। লনের কাছের অংশটুকু পরীক্ষা করলাম তীক্ষ্ণ চোখে। ছোট মানুষদের প্রশ্ন করলাম, সাধ্যমত চেষ্টা করলাম কী বলছি তা বোঝানর, কিন্তু শুধু সময়ই নষ্ট হলো। লাভ হলো না কিছুই। আমার অঙ্গভঙ্গি কেউ বুঝল না, কেউ চুপচাপ থাকল, কেউ আবার হাসল আমি ভাঁড়ামি করছি ভেবে।

'কিন্তু উপায় নেই। ভয় আর অন্ধ ক্রোধ যে ভূতের জন্ম দিয়েছে, সেটা এখনও নামেনি ঘাড় থেকে। আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সুযোগ নিতে চাইছে বার বার। ঘাসে ঢাকা জায়গাটার ওপরে, যেখানে টানা-হ্যাঁচড়া করেছিলাম মেশিনটা

নিয়ে, সেখানে আমার পায়ের চিহ্ন রয়েছে। ওখান থেকে স্ফিংক্সের বেদীর মাঝামাঝি জায়গায় কোনকিছু হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার গভীর কাটা দাগ। সরু, আশ্চর্য এক ধরনের পায়ের ছাপও দেখা গেল। মনে হলো, শূথের। এই ছাপ আমাকে আরও আকৃষ্ট করল বেদীর দিকে। যা ভেবেছি তাই। বেদীটা ব্রোঞ্জের। শুধু একটা ব্লক নয়। বেদীর দু'ধারই ফ্রেম করা প্যানেলে চমৎকারভাবে সাজানো। জোরে জোরে আঘাত করলাম বেদীতে। ভেতরটা ফাঁপা। প্যানেলগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝলাম, ফ্রেমের সঙ্গে সংযুক্ত নয় ওগুলো। হাতল বা চাবি ঢোকানর কোন ফুটো নেই। আমার ধারণা, প্যানেলগুলোই দরজা। খোলা যায় ভেতর থেকে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম। অবশ্য টাইম মেশিনটা যে বেদীর ভেতরে আছে, এটা বোঝার জন্যে বেশি মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কিন্তু টাইম মেশিনটা ওখানে নিয়ে যাওয়া হলো কেমন করে?

'কমলা রঙের কাপড় পরা দু'জন লোকের মাথা দেখা গেল। পুষ্পিত কিছু আপেল গাছের নিচ দিয়ে, ঝোপঝাড় ভেদ করে এদিকেই আসছে। ওদের দিকে চেয়ে হাসলাম। ডাকলাম ইশারায়। ওরা এলে ব্রোঞ্জের বেদীর দিকে দেখিয়ে বোঝাতে চাইলাম, আমি খুলতে চাই ওটা। কিন্তু আমার এই ভঙ্গি দেখে অস্বাভাবিক এক আচরণ করল ওরা। ওদের সেই অভিব্যক্তি আপনাদের কেমন করে বোঝাব তাই ভাবছি। কোমল মনের কোন মহিলার সামনে অত্যন্ত অশোভন কোন ভঙ্গি করলে তার যে প্রতিক্রিয়া হবে, অনেকটা তেমনি। সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে চলে গেল ওরা যেন চরমতম অপমান করেছি। মিষ্টি চেহারার শাদা কাপড় পরা আরেকজনকে প্রশ্ন করলাম। একই প্রতিক্রিয়া হলো। কিন্তু টাইম মেশিনটা আমার চাই বলে আরেকবার কথাটা বললাম। আর দু'জনের মতই ঘুরে রওনা দিল সে। মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার। তিন লাফ দিয়ে ওর গলার পেছনে রোবের ঢিলে জায়গাটা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললাম স্ফিংক্সের দিকে। আতঙ্কে এবং বিরক্তিতে ওর মুখের এমন এক চেহারা হলো, চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলাম।

'আমার উত্তেজনা কমেনি তখনও। ব্রোঞ্জের বেদীতে ঘুসি মারলাম জোরে জোরে। কিছু একটা নড়ার মত শব্দ পেলাম। স্পষ্ট করে বলতে গেলে, চাপা হাসির মত একটা আওয়াজ। হয়তো সবটাই ভুল শুনেছি। নদী থেকে বড় একটা পাথর এনে জোরে জোরে ঘা দিলাম। অলঙ্কৃত জায়গাটার একটা খাঁজ সমান হয়ে গেল। তাম্রমল গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। এই তীব্র শব্দ দু'পাশে মাইলখানেক দূর থেকেও নিশ্চয় শুনতে পেল দুর্বল, খুদে মানুষেরা। কিন্তু কেউ এল না। ঢালু জায়গাতে তাদের একদলকে দেখলাম। চোরা চোখে দেখছে আমাকে। শেষে গরমে, শ্রান্তিতে জায়গাটা ভাল করে দেখার জন্যে বসে পড়লাম। কিন্তু মনের অস্থিরতা আমাকে বেশিক্ষণ বসে থাকতে দিল না।

'খানিক পর উঠে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে আবার হাঁটা দিলাম পাহাড়ের দিকে। "ধৈর্য ধর হে," নিজেকেই বললাম আমি। "মেশিন যদি ফিরে পেতে চাও, সরে এসো স্ফিংক্সের কাছ থেকে। যদি ওরা তোমার মেশিন ইচ্ছে করেই লুকিয়ে রাখে তাহলে ব্রোঞ্জের বেদী ভেঙে কোন লাভ হবে না। বরং

মজা দেখার জন্যে নিয়ে গিয়ে থাকলে পরে হয়তো চাইলেই ফেরত পাওয়া যাবে। অজানা এইসব জিনিসের মাঝে হতভম্বের মত বসে থাকলে হতাশা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। মুখোমুখি হও এ-পৃথিবীর। এটার নিয়ম-কানুন জেনে নাও। সবকিছু লক্ষ কর তীক্ষ্ণ চোখে। তাড়াহুড়ো করে বাজে কোন অর্থ বের করো না। সবকিছুর সূত্র তুমি শেষে পেয়ে যাবেই যাবে।" হঠাৎ করেই পরিস্থিতির হাস্যকর দিকটার কথা মনে পড়ে গেল। ভবিষ্যতে আসার চেষ্টায় কত পড়াশোনা, কত কঠিন পরিশ্রমই না করেছি। অথচ এখান থেকে পালানর চিন্তায় এখন আমি এক পায়ে খাড়া। মানুষের তৈরি যাবতীয় জটিল আর কঠিন ফাঁদের জটিলতম ফাঁদটিতে আটকা পড়েছি আমি। এ-ফাঁদ যদিও আমার নিজেরই তৈরি, তবু এর বাইরে বেরোনোর কোন বুদ্ধি পাচ্ছি না। পাগলের মত হা হা করে হেসে উঠলাম।

'বড়ো প্রাসাদে গিয়ে মনে হলো ওরা যেন আমাকে এড়িয়ে চলছে। এটা হয়তো আমার নিছক কল্পনা। কিংবা হতে পারে, ব্রোঞ্জের দরজায় পেটানর ফলে ওরা এরকম আচরণ করছে। তবে হাবভাব দেখে মনে হয়, এড়িয়েই চলছে। খুব সাবধান হলাম আমি। তারা ভয় পায় এমন একটা কাজও করলাম না। ফলে দু'একদিনের মধ্যেই স্বাভাবিকতা ফিরে এল। তাদের ভাষা শেখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলাম। তার সঙ্গে সঙ্গে চলল আশেপাশে অনুসন্ধান। আপাতত যতটা পারি টাইম মেশিন বা স্ফিংক্সের বেদীর ব্রোঞ্জের দরজার রহস্য ভুলে থাকব বলে মনস্থির করলাম। আমার বুদ্ধি পরে স্বাভাবিকভাবেই পথ বাতলে দেবে আমাকে। তবু, বুঝতেই পারছেন, মন পড়ে রইল প্রথম যেখানটায় পৌঁছেছিলাম তারই কয়েক মাইল ঘিরে।'

আট

ব্যাখ্যা

'যতদূর চোখ যায়, টেমস উপত্যকার মতই সমৃদ্ধ। যে পাহাড়েই উঠেছি, দেখেছি সুন্দর সুন্দর প্রচুর বিল্ডিং। বিচিত্র ধরনের গড়ন একেকটার। চিরসবুজ ঘন ঝোপঝাড়। ফুলে ভরা গাছ আর লতাপাতা। এখানে সেখানে রুপোর মত চকচকে পানি। তার পেছনে ভূমি উঁচু হয়ে গিয়ে মিশেছে শান্ত আকাশের গায়ে হেলান দেয়া নীল তরঙ্গায়িত পাহাড়ে। অদ্ভুত যে-জিনিসটা এখন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা হলো অসংখ্য কুয়ো। মনে হয় বেশ গভীর হবে কুয়োগুলো। গতকালই দেখেছি পাহাড়ে আসার রাস্তার পাশে কুয়োটা। অন্যান্যগুলোর মতই বিচিত্র গঠন এটার। ব্রোঞ্জের বেড়, বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্যে ছোট একটা গম্বুজ। কুয়োর ধারে বসে উঁকি দিলাম ভেতরে। অন্ধকার। পানির কোন চিহ্ন দেখা গেল না। তবে, বড়ো ইঞ্জিন চলার মত ধপ্ ধপ্ ধপ্ ধপ্ শব্দ কানে এল। উঠে দেশলাই জ্বালিয়ে কুয়োর মুখে ধরে বুঝলাম তীব্র বাতাস ঘুরতে ঘুরতে নেমে যাচ্ছে নিচে। এক টুকরো কাগজ ফেললাম। ধীরে ধীরে উড়তে উড়তে নিচে পড়ার কথা ওটার। তার

বদলে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল বাতাসের টানে।

ঢালুর ওপরের বিক্ষিপ্ত উঁচু টাওয়ারগুলোর সঙ্গে কুয়োগুলোর একটা যোগাযোগ আছে বলে মনে হলো আমার। গরমের দিনে সমুদ্র সৈকতের ওপর উত্তপ্ত বাতাসের যেরকম কম্পমান আভাস দেখা যায় তেমনি দেখলাম টাওয়ারগুলোর মাথায়। দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাল, ভূমধ্যসাগরীয় বায়ু নিষ্কাশন পদ্ধতি এটা। তবে পদ্ধতিটা এখানে এনেছে কে, বলা কঠিন। প্রথমে ভেবেছি, এদের স্বাস্থ্যরক্ষার সাথে ওটার কোন যোগাযোগ আছে। আপাতদৃষ্টিতে সেরকম মনে হলেও ধারণাটা আসলে সম্পূর্ণ ভুল।

ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে যে-ক'দিন ছিলাম তার মধ্যে ওদের পয়ঃপ্রণালী, সময়ের হিসাব, যাতায়াত ব্যবস্থা কিংবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে পুরো ধারণা করে উঠতে পারিনি। ভবিষ্যৎ পৃথিবী কিংবা স্বর্গরাজ্যের ধ্যান-ধারণার ওপর পড়াশোনা করেছি আমি। ঘরবাড়ি, সামাজিক ব্যবস্থা এবং আরও বিষয় সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আছে সেসব লেখায়। তবে পার্থক্য আছে কল্পনা আর বাস্তবে। যদি ওধরনের কোন জায়গায় সত্যি এসে পড়ে কোন ভ্রমণকারী, গোলকধাঁধায় পড়ে যাবে। যেমন আমি পড়েছি। লণ্ডনের সেই গল্পের কথাই ধরুন না। মধ্য আফ্রিকার এক নিগ্রো এসেই আবার ফিরে গেল তার আপন ভূমিতে। রেলওয়ে কোম্পানি, পার্সেল ডেলিভারী কোম্পানি, পোস্টাল অর্ডার, টেলিফোন বা টেলিগ্রাফের তার, সামাজিক তৎপরতা ইত্যাদি বিষয়ে সে কতটুকুই বা জানবে? তবু তো আমরা জিনিসগুলো ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী ছিলাম। এরপরও সে যতটুকু শিখল, তাতে তার যেসব বন্ধু কোনদিন ভ্রমণ করেনি, তাদের কি বোঝাতে বা বিশ্বাস করাতে পারবে? এখন ভেবে দেখুন, আমাদের সময়ে একজন শাদা মানুষের সঙ্গে একজন নিগ্রোর পার্থক্য কত কম সে তুলনায় আমার ও স্বর্ণযুগের মধ্যে পার্থক্য কতখানি! অজানা বা আরামদায়ক বস্তু বিষয়ে আমি খুব সচেতন। কিন্তু স্বয়ংক্রিয় সংগঠনের যে সাধারণ প্রভাব আছে আমি সেটা মানি না। বকলাম অনেকেই কিন্তু মনে হয় না পার্থক্যটা আপনাদের খুব একটা বোঝাতে পেরেছি

উদাহরণস্বরূপ ধরুন– কবর দেয়া। মৃতদেহ পোড়ানর চুল্লি বা কবর জাতীয় কোনকিছুই আমার চোখে পড়েনি। তবে আমার অনুসন্ধানের এলাকার অন্তরালে থাকতেও পারে কবরস্থান বা পোড়ানর চুল্লি। আরেকটা প্রশ্ন মনে জেগেছিল। প্রথমে আমার কৌতূহল পুরোপুরি মার খায় এ-বিষয়ে হতভম্ব হয়ে আরেকটা মত পোষণ করি সেটা আরও হতভম্ব করে দেয় আমাকে। কথাটা হলো, এদের মধ্যে কোন বুড়ো বা অথর্ব লোক নেই।

আমাকে স্বীকার করতেই হবে, স্বয়ংক্রিয় সভ্যতা আর অবক্ষয়িত মনুষ্যত্ব বিষয়ক আমার প্রথম মতবাদগুলো যে-তৃপ্তি দিয়েছিল, তা বেশিক্ষণ টেকেনি। কিন্তু নতুন আর কোনকিছুও চিন্তা করতে পারলাম না অসুবিধাগুলো বলি। বিশাল বিশাল সব প্রাসাদে শুধু লিভিং রুম, বড়ো বড়ো ডাইনিং হল আর শয়নকক্ষে ভর্তি কোন রকম যন্ত্রপাতি বা তার প্রয়োগ দেখিনি। তবু এরা চমৎকার সব পোশাক পরে আছে। এগুলো একসময় পুরানো হয়ে গেলে নিশ্চয় বদলানর দরকার পড়ে তাদের ধাতব স্যাণ্ডেলগুলোর চেহারা-সুরত ভাল না

হলেও মোটামুটি জটিল পদ্ধতিতেই তৈরি। কথা হলো, এগুলো কোথাও কোন প্রকারে নিশ্চয় তৈরি হয়। অথচ কোন কিছু সৃষ্টির আগ্রহ লেশমাত্র নেই এদের মধ্যে নেই কোন দোকান, কারখানা। সারাটা সময় তারা শান্তশিষ্টভাবে খেলছে, নদীতে গোসল করছে, ভালবাসাবাসি করছে খেলাচ্ছলে, ফল খাচ্ছে আর ঘুমাচ্ছে। তাদের দিনকাল চলছে কী করে, বুঝলাম না।

'আবার আসছে টাইম মেশিনের কথা। শাদা স্ফিংক্সের ফাঁপা বেদীর ভেতরে ওটাকে কারা নিয়ে গেছে জানি না। কেন নিয়ে গেছে তাও জানি না। অনেক চিন্তা করেও কারণ খুঁজে পাইনি। এছাড়াও রয়েছে সেই শুকনো কুয়ো, জ্বলজ্বলে স্তম্ভ। মনে হয় কোন সূত্র হারিয়ে ফেলেছি পাবই বা কী ভাবে? ধরা যাক, চমৎকার ঝরঝরে ইংরেজীতে কোন খোদাই পাওয়া গেল কিন্তু একেবারেই অজানা কোন ভাষা যদি তার ফাঁকে ফাঁকে বসিয়ে দেয়া হয়, তখন কেমন হবে? আটলক্ষ দু'হাজার সাতশো এক খ্রিস্টাব্দে আমার ভ্রমণের তৃতীয়দিনে তেমনি ধাঁধা লেগেছিল আমার।

'সেদিনই অবশ্য একজন বন্ধু জুটল আমার। অগভীর পানিতে গোসল করা দেখছি খুদে মানুষগুলোর হঠাৎ মাংসপেশীতে খিল ধরল একজনের। ভেসে যেতে লাগল ভাটির দিকে। স্রোতের বেগ মোটামুটি তীব্রই, তবে মাঝারি ধরনের সাঁতারুরও তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। চোখের সামনে চিৎকার করতে করতে মেয়েটি ডুবে যাচ্ছে দেখেও রক্ষা করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করল না কেউ তাহলেই বুঝুন, কী পরিমাণ দুর্বল ওরা। তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় খুলে ভাটির দিকে নেমে নিরাপদেই ডাঙায় তুললাম হতভাগ্য মেয়েটিকে। একটু মালিশ করতেই সুস্থ হয়ে উঠল সে। তৃপ্তমনেই ওখান থেকে চলে এলাম ওদের সম্বন্ধে এত নীচু ধারণা হয়েছিল যে, কোন কৃতজ্ঞতাও আশা করিনি। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো পরে

'ঘটনাটা ঘটেছিল সকালে বিকেলে অনুসন্ধান সেরে আমার বাসস্থানের দিকে ফিরছি, দেখা হলো ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে। আমাকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে ফুলের একটা বিরাট মালা উপহার দিল আমাকে বোঝা গেল আমার জন্যে, শুধু আমার জন্যেই তৈরি করেছে সে মালাটা মন কেমন যেন হয়ে গেল আমার আমার নিঃসঙ্গতাই হয়তো উতলা করল আমাকে চমৎকার, পাথরে ঘেরা একটা জায়গায় বসলাম আমরা। কথাবার্তা বললাম তার বেশির ভাগই শুধু হাসি তার উপহার পেয়ে আমি যে খুব খুশি হয়েছি, এটা বোঝানর আপ্রাণ চেষ্টা করলাম শিশুদের মত এক ধরনের সরল বন্ধুত্ব অনুভব করলাম তার সঙ্গে পরস্পর পরস্পরকে ফুল দিলাম আমরা আমার হাতে চুমো খেল সে আমিও কথা বলার চেষ্টা করে জানলাম, তার নাম– উইনা নামটার কোন অর্থ না বুঝেও মনে হলো, তাকে এই নামেই মানিয়েছে

'একেবারে শিশুর মত মেয়েটা। সবসময় আমার সঙ্গে থাকতে চায় সব জায়গায় আমার সঙ্গে যেতে চায়। ওকে ছেড়ে ছুট দিই আমি সেও ছোটে শেষমেশ ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে থেমে যায়, বিলাপ করে আমাকে ডেকে ডেকে। ওকে ছেড়ে আসতে খুব খারাপ লাগে কিন্তু উপায় নেই। এই পৃথিবীর রহস্যগুলোর

জট খুলতেই হবে আমাকে। নিজের মনেই বলতাম, ভবিষ্যতের এক পৃথিবীতে আমি প্রেমের ভান করতে আসিনি। তবু তাকে অসহায়ভাবে ছেড়ে আসতে খুব খারাপ লাগে আমার। কোথাও তাকে ফেলে এলে থেকে থেকে উন্মাদের মত অনুযোগ করে সে। সব মিলিয়ে তার গভীর অনুরক্তি আমার জন্যে সুবিধা অসুবিধা দুটোরই কারণ হয়। এ-সবকিছুর পরও তাকে খুব ভাল লাগে আমার। ভাবি, শিশুদের মত একটা আবেগেই এই গভীর আসক্তির কারণ। আমাকে নিয়ে খুব ভাবে এটা বোঝানর ওর দুর্বল, ব্যর্থ চেষ্টা দেখে ভাবি, শুধুমাত্র আবেগে সে এরকম করছে কিন্তু পরে সারাদিনের অনুসন্ধান সেরে শাদা স্ফিংক্সের কাছাকাছি আসতেই পুতুলের মত মেয়েটি এমন করত, সত্যি সত্যি মনে হত, আমি যেন বাড়ি ফিরেছি। পাহাড় পেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ওর শাদা, সোনালি ছোট্ট চেহারাটা দেখার আশায় আশায় থাকতাম।

ওর কাছ থেকেই জানলাম, ভয়ের অনুভূতি এখনও পৃথিবীতে রয়ে গেছে। দিনের বেলা ওর কোন ভয় নেই। গভীর বিশ্বাস আমার ওপর একবার ভয় দেখানর মত একটা ভঙ্গি করেছিলাম। ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, হেসে উঠেছিল কিন্তু অন্ধকার, ছায়া, কালো জিনিস, রাতকে ভয় পায় সে। তার ভয়ের একমাত্র জিনিস হলে– অন্ধকার। অন্ধকারই ওর একমাত্র যন্ত্রণা। বিষয়টা আমাকে খুব ভাবায়। ঘটনাটা কী? খেয়াল করে দেখলাম রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো বড়ো বাড়িগুলোতে সমবেত হয় সমস্ত মানুষ। তারপর গাদাগাদি করে ঘুমায়। অন্ধকারে ওখানে ঢুকলে কিসের যেন আশঙ্কায় প্রবল আলোড়ন শুরু হয়ে যায় তাদের। রাতে কউকে দরজার বাইরে দেখা যায় না। ঘরের ভেতরও একা ঘুমায় না কেউ। এমন বোকা আমি, এসব দেখেও কিছু বুঝতে পারি না। উইনার ভীষণ ভয় সত্ত্বেও ওকে ভিড় ছেড়ে বাইরে এসে ঘুমাতে বলি।

এটা ওর পক্ষে খুবই কঠিন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার জেদ আর ওই অদ্ভুত আসক্তিরই জয় হলো। সবসুদ্ধ পাঁচ দিন একসঙ্গে থেকেছি আমরা। আমার বাহুর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়েছে ও।

কিন্তু উইনার কথা বলতে গিয়ে আমি মূল ঘটনা থেকে সরে গেছি। উইনাকে উদ্ধার করার আগের রাতে আমার যখন ঘুম ভাঙল তখন মাত্র আলো ফুটতে শুরু করেছে। খুব অস্থির লাগছিল ঘুমের মধ্যে। স্বপ্ন দেখছিলাম, আমি ডুবে যাচ্ছি। সী অ্যানিমোনির আলতো স্পর্শ লাগছে মুখের ওপর। ঘুম ভাঙতেই মনে হলো, ধূসর কী যেন একটা জন্তু দৌড়ে বের হয়ে গেল ঘর থেকে। আবার ঘুমাবার চেষ্টা করলাম। অত্যন্ত অস্থির আর অস্বস্তি লাগল। উষালগ্নে সবকিছু ধীরে ধীরে অন্ধকার থেকে আসে আলোয়। সব বর্ণহীন মনে হয়। পরিষ্কার, তবু যেন অবাস্তব। উঠে বড়ো হলঘর পেরিয়ে প্রাসাদের সামনের ফ্লাগস্টোনের চত্বরে এলাম। ভাবলাম, সূর্যোদয় দেখব।

চাঁদ ডুবছে। মুমূর্ষু জ্যোৎস্না আর প্রথম উষার বিবর্ণতা মিলে ভয়ঙ্কর এক আধো আলো আধো অন্ধকারের সৃষ্টি করেছে। কলির মত কালো কোণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। ধূসর মাটি। বর্ণহীন বিষণ্ন আকাশ। পাহাড়টা ভূতুড়ে মনে হচ্ছে। চলতে হাঁটতে হাঁটতে বেশ কয়েকবার শাদা দেহের কী যেন দেখতে পেলাম।

দু'বার মনে হলো শাদা বানরাকৃতির কি একটা প্রাণী খুব দ্রুত উঠে গেল পাহাড়ে। আরেকবার মনে হলো, ধ্বংসাবশেষের কাছ দিয়ে কয়েকটা প্রাণী মিলে কালো শরীরের কী যেন একটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। খুব দ্রুত চলাফেরা করছে ওগুলো। কোথায় গেল ঠিকমত খেয়াল করতে পারলাম না। মনে হলো, অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের মাঝে। এখনও খুব পরিষ্কার হয়নি চারপাশ। প্রথম ভোরের তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগছে। চোখে যেন ভুল দেখছি।

ধীরে ধীরে ফর্সা হচ্ছে পুবের আকাশ। বিচিত্র বর্ণালী ছড়িয়ে সূর্য উঠল। এল আরেকটা দিন। প্রতিটি দৃশ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। শাদা শরীরের সেই প্রাণীর কোন চিহ্ন নেই কোথাও। আধো আলো আধো ছায়ার জীব ওগুলো। "নিশ্চয় ওগুলো ভূত," মনে মনে বললাম আমি। "কোন কালের ভূত?" গ্র্যান্ট অ্যালেনের সেই অদ্ভুত তত্ত্বের কথা মনে হলো। তাঁর মতে, যদি মানুষ বংশ পরম্পরায় মরে ভূত হয়ে যায় তবে একসময় পৃথিবী ভূতে ভরে যাবে। যদি তাই হয় তাহলে এই আট লক্ষ খ্রীস্টাব্দে অসংখ্য ভূত জমা হয়ে গেছে। তাদের চারটেকে একসঙ্গে দেখা এখন মোটেই আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু এই মজার কথা মনে করেও মনটা প্রফুল্ল হলো না। উইনাকে উদ্ধার করার আগে পর্যন্ত এ-অবস্থা চলল। টাইম মেশিনের খোঁজে প্রথমে যে শাদা শাদা শরীর দেখেছিলাম, মনে হয় এগুলোই।

আমাদের চেয়ে স্বর্ণযুগের আবহাওয়া অনেক গরম। ঠিক কী কারণে বলতে পারব না। হয়তো সূর্যের উত্তাপ বেড়ে গেছে বা পৃথিবীই সূর্যের নিকটবর্তী হয়েছে। আমরা জানি, ভবিষ্যতে সূর্য ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে থাকবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ডারউইনের প্রথম দিকের তত্ত্বের অনেক কিছুই জানে না। একসময় গ্রহগুলো একের পর এক সূর্যের ওপর পড়ে যাবেই। এই বিপর্যয়ের ফলে নতুন তেজে জ্বলে উঠবে সূর্য। অন্তর্বর্তী কোন গ্রহকে এই তেজ সহ্য করতে হবে। কারণ যাই হোক, মূল কথা, আমাদের চেয়ে অনেক বেশি তাপ স্বর্ণযুগের সূর্যের।

চতুর্থ দিন সকালে সূর্যের ভয়ঙ্কর তাপ থেকে বাঁচার জন্যে বিরাট একটা ধ্বংসাবশেষের ভেতর আশ্রয় নিয়েছি। পাশেই সেই বিশাল বাড়ি যেখানে আমার থাকা-খাওয়া চলে। ধ্বংসাবশেষেই ঘটল সেই অদ্ভুত ঘটনা। কোনমতে বিশাল স্তূপাকৃতির ওপরে উঠে সরু একটা গ্যালারি পেলাম। শেষের এবং দু'ধারের জানালা ভেঙে পড়া পাথরের স্তূপে বন্ধ। বাইরের আলোর তুলনায় আঁধারটা প্রথমে দুর্ভেদ্য মনে হলো আমার। হাতড়াতে হাতড়াতে ভেতরে ঢুকলাম। আলো থেকে হঠাৎ আঁধারে এসে মনে হচ্ছে, বিভিন্ন রঙের ফুটকি স্রোতের মত বয়ে চলেছে। হঠাৎ যেন সম্মোহিত হয়ে থমকে দাঁড়ালাম। গাঢ় অন্ধকারে জ্বলজ্বলে একজোড়া চোখ চেয়ে আছে আমার দিকে।

বন্য জন্তুর পুরানো সহজাত ভয় পেয়ে বসল আমাকে। দু'হাত মুঠি পাকিয়ে অপলক চেয়ে থাকলাম সেই জ্বলন্ত চোখের দিকে। ঘোরার সাহস হলো না। এখনকার জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তার কথা মনে পড়ল। তারপরই মনে পড়ল আঁধারের অদ্ভুত ত্রাসের কথা। একটু ধাতস্থ হয়ে এক পা এগিয়ে কথা বলে উঠলাম। কণ্ঠ এমনিতেই কাঁপছে আমার। গলাটা কর্কশ শোনাল। হাত বাড়াতেই নরম কিছুতে যেন স্পর্শ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে একপাশে ঘুরে গেল চোখজোড়া। শাদা কী

যেন ছুটে গেল পাশ দিয়ে। দম বন্ধ অবস্থায় ঘুরে দেখি, বানরের মত একটা প্রাণী। বিচিত্রভাবে মাথাটা নোয়ানো আমার পেছনের রৌদ্রালোকিত স্থানটুকু দৌড়ে পার হচ্ছে। গ্রানিটের একটা ব্লকের দিকে অন্ধের মতো ছুটে গেল ওটা। টলমল করে পাশ কাটিয়ে মুহূর্তের মধ্যে আরেক স্তূপতোর ধ্বংসাবশেষের কালো ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল

'জন্তুটা সম্বন্ধে আমার ধারণা নিখুঁত নয়। গায়ের রঙ তবে নিশ্চয় শাদা অদ্ভুত ধূসর-লাল চোখ মাথার চুল হালকা হলুদ, শনের দড়ির মত নেমে গেছে পেছন দিকে। কিন্তু এত জোরে দৌড়েছে ওটা, পরিষ্কারভাবে দেখা সম্ভব হয়নি। চার হাতপায়ে, নাকি হাত খুব নিচু করে তার ওপর ভর দিয়ে দৌড়েছে তা-ও বলতে পারব না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গেলাম দ্বিতীয় ধ্বংসস্তূপে প্রথমে খুঁজে পেলাম না খানিক পর সেই অজানা জায়গায় একটা গোল কুয়োমত পেলাম একটা থাম ভেঙে পড়ে অর্ধেকটা বন্ধ হয়ে গেছে চকিতে একটা চিন্তা এল মাথায়। ওটা এই গর্ত দিয়েই নেমে যায়নি তো? দেশলাই জ্বালিয়ে নিচে তাকালাম। শাদা ছোট একটা প্রাণী নড়চড়া করছে। বড়ো বড়ো উজ্জ্বল চোখ দেখেই মনে হলো, যেটা পালিয়েছে সেটাই মানুষ আর মাকড়সার মাঝামাঝি একটা চেহারা। শিউরে উঠলাম। দেয়াল বেয়ে বেয়ে নিচে নামছে ওটা। প্রথমবারের মত খেয়াল করলাম ধাতব অনেকগুলো পাদানি আর হাতল মিলিয়ে মইয়ের মত একটা জিনিস নেমে গেছে গর্তের নিচে হাতে আগুনের ছ্যাঁকা লাগতে ছেড়ে দিলাম কাঠিটা। আরেকটা কাঠি জ্বাললাম যখন ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে খুদে দানবটা।

'কুয়োর ভেতরে চেয়ে কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না বেশ কিছুক্ষণ মনের সাথে যুদ্ধ করলাম। ভাবলাম যেটা দেখলাম, ওটা মানুষই মন সায় দিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে মনে হলো, সত্যিই হয়তো তাই মানুষ এখন আর এক প্রজাতির নেই। দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে বংশপরম্পরায় ওপরের পৃথিবীর সুন্দর শিশুরাই শুধু জন্মগ্রহণ করেনি। শাদা, কুৎসিত এই নিশাচররাও কালেরই উত্তরাধিকারী

'কম্পমান জ্বলজ্বলে স্তম্ভ আর পাতালের বায়ু নিষ্কাশন পদ্ধতি বিষয়ক আমার মতবাদের কথা মনে পড়ে গেল। এর সত্যিকারের প্রচলন কারা করেছে, দ্বিধায় পড়ে গেলাম। আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম, যে সুষম সংগঠনের কথা আমি কল্পনা করেছি, এই নিশাচর বানরেরা কি তারই জন্যে কাজ করে চলেছে? ওপরের পৃথিবীর চমৎকার, পরিশ্রমবিমুখ শান্ত লোকদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক কী? কুয়োর তলাতেই বা কী লুকিয়ে আছে? কুয়োর ধারে বসে ভাবলাম, ভরা পাবার কিছু নেই। আমার অসুবিধাগুলোর সমাধান খুঁজে বের করতেই হবে এত চিন্তাভাবনা সত্ত্বেও ভয়ে কুয়োতে নামতেই পারলাম না ইতস্তত করছি, এমন সময় সুন্দরী দু'জন লোক এল ভালবাসার উচ্ছল খেলা খেলতে খেলতে সূর্যালোক ছেড়ে চলে গেল ছায়ায়। মেয়েটির পেছনে তাড়া করছে পুরুষটা দৌড়াচ্ছে দৌড়াচ্ছে ফুল ছুঁড়ে মারছে মেয়েটার দিকে।

'উল্টে পড়া থামের গায়ে হাত রেখে আমাকে কুয়োর ভেতর তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসি বন্ধ হয়ে গেল তাদের ছোট এই গর্তের একটা অদ্ভুত অর্থ আছে

তাদের কাছে কারণ গর্তটা দেখিয়ে তাদের ভাষায় ভাঙা ভাঙা ভাবে একটা প্রশ্ন করতে যেতেই ওদের মুখ আরও শুকিয়ে গেল। ঘুরে দাঁড়াল কিন্তু আমার দেশলাইয়ের ওপর চোখ পড়তেই কৌতূহলী হয়ে উঠল ওরা। আমিও কয়েকটা কাঠি জ্বাললাম ওদের আনন্দ দিতে। কুয়ো প্রসঙ্গে আবার প্রশ্ন করলাম। এবারও কোন উত্তর পেলাম না উইনার কাছে যাব বলে ঠিক করলাম। দেখি সে কিছু সাহায্য করতে পারে কিনা কিন্তু আমার মনের ভেতরে ইতিমধ্যেই তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে আমার ধ্যান-ধারণাগুলো ভেঙেচুরে নতুন আরেকটা রূপ নিতে যাচ্ছে কুয়ো, বায়ু নিষ্কাশনের টাওয়ার, এগুলোর প্রচলন এবং ভূতের রহস্যের একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছি তবে ব্রোঞ্জের দরজার অর্থ ব টাইম মেশিনটার কী অবস্থা সে সম্বন্ধে এখনও কিছুই জানি না এদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান বিষয়ে খুব অস্পষ্ট একটা চিন্তা আসছে মাথায় যা হতভম্ব করে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট

'আমার নতুন ধারণাটার কথা বলি। এই দ্বিতীয় প্রজাতির মানুষ ভূমধ্যসাগরীয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনটে জিনিস দেখে আমার মনে হলো এরা দীর্ঘদিন ধরেই পাতালে বসবাস করে আসছে। প্রথমত দিনের পর দিন আঁধারে বাস করলে এ ধরনের শাদা রঙ হয় গায়ের উদাহরণ হিসেবে কেন্টাকি গুহার শাদা মাছের কথা বলা যায়। দ্বিতীয়ত নিশাচর জীবমাত্রেরই চোখ বড়ো বড়ো এবং তাতে আলোর প্রতিফলন ঘটে যেমন পেঁচা বা বেড়ালের চোখ। তৃতীয়ত সূর্যের আলোতে বিভ্রান্তি, কালো ছায়া দেখার সঙ্গে সঙ্গে হাতড়াতে হাতড়াতে অদ্ভুতভাবে সেদিকে ছুটে যাওয়া আর আলোতে থাকাকালীন বিচিত্রভাবে মাথা গুঁজে থাকা সবই রেটিনার চূড়ান্ত সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়ার নির্দেশক

'আমার পায়ের তলার মাটির নিচে নিশ্চয় তাহলে বিশাল বিশাল সব সুড়ঙ্গ আছে। সেই সুড়ঙ্গে বাস করে এই নতুন প্রজাতির মানুষেরা নদীর উপত্যকা ছাড়াও পাহাড়ের ঢালে, সত্যি বলতে কি সর্বত্র বায়ু নিষ্কাশনের গর্ত দেখেই বোঝা যায় এদের বিস্তার কতটা স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, পাতালের অধিবাসীরা খেটে ওপরের অধিবাসীদের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করছে। ধারণাটা আপাতদৃষ্টিতে এতটা যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে, সেটাকে সত্যি ধরে নিয়ে ভাবতে লাগলাম, এরা দু'ভাগে বিভক্ত হলো কিভাবে? কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই বুঝেছিলাম, কতখানি অসার আমার ধারণাটা।

'প্রথমত আমাদের কাল থেকে শুরু করে সমস্যার বিচার করে দিবালোকের মত স্পষ্ট বুঝলাম, পুঁজিবাদী এবং শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেকার অস্থায়ী সামাজিক পার্থক্যই হলো এই রহস্যময় পরিস্থিতির মূল চাবিকাঠি। এই পার্থক্যই বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত এই পর্যায়ে এসে ঠেকেছে সন্দেহ নেই কথাটা আপনাদের কাছে অদ্ভুত আর একেবারেই অবিশ্বাস্য মনে হবে কিন্তু এটা প্রমাণ করার মত জলজ্যান্ত পরিস্থিতি এখনও বিদ্যমান। সভ্যতার স্বল্প প্রয়োজনে পাতাল ব্যবহার করার প্রবণতা এখনও আছে। উদাহরণ হিসেবে লণ্ডনের মেট্রোপলিটন রেলওয়ে, বৈদ্যুতিক রেলওয়ে, ভূগর্ভস্থ পথ, রেস্তোরাঁ, কারখানা এগুলোর কথা বলা যায় দিন দিন দ্বিগুণ চতুর্গুণ হচ্ছে এসব। এই প্রবণতা বাড়তে বাড়তে এমন এক

পর্যায়ে পৌঁছবে যখন কল-কারখানা হারাবে তার আকাশের নিচের জন্মভূমি অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, ভূগর্ভে কল-কারখানার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত মাটির ওপরের কোন কল-কারখানার আর দরকার হবে না। পূর্বাঞ্চলের দরিদ্র শ্রমিকেরা এখনই যে-জীবনযাপন করছে তা কি মাটির ওপরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়?

'আবার দেখুন, ধনীরা চায় শিক্ষার উন্নতি অব্যাহত থাকুক। তারা চায় গরীবদের রূঢ় হিংস্রতা এবং তাদের নিজেদের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান অবশ্য এই ব্যবধান কমিয়ে আনছে ধনীরা নিজেদের দখলে বেশি জমি রাখার স্বার্থে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, লণ্ডনের মনোরম এলাকার প্রায় অর্ধেক অংশে অনধিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উচ্চতর শিক্ষা, ক্রমবর্দ্ধমান সুযোগ-সুবিধা আর মার্জিত অভ্যাসের প্রলোভনে যে-ব্যবধানের সৃষ্টি সেই ব্যবধানই একদিন যোগাযোগ ঘটাবে শ্রেণীতে শ্রেণীতে। পরস্পর বিয়ে দিয়ে জাতে তোলা হবে গরীবদের। এই প্রক্রিয়া প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া সামাজিক স্তরবিন্যাসের পাশাপাশি জাতিতে জাতিতে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়াটা আপাতত রোধ করছে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মাটির ওপরে থাকবে ধনীরা, আরাম-আয়েশ আর সৌন্দর্যের চিন্তায় বিভোর মাটির নিচে থাকবে গরীবেরা, তাদের শ্রমের সাথে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করে নেবে নিজেদের। একবার মাটির নিচে গেলে আর উপায় নেই বায়ু নিষ্কাশনের গর্তের জন্যে মোটা ভাড়া দিতে হবে। দিতে অস্বীকার করলে বাকি ভাড়ার জন্যে না খাইয়ে বা দম বন্ধ করে কষ্ট দেয়া হবে তাদের। দুর্দশার চরম হবে অবাধ্যদের বিদ্রোহীদের হবে মৃত্যু এক সময় রক্ষা হবে ভারসাম্য। যারা বেঁচে থাকবে তারা মেনে নেবে এ-জীবন ওপরের পৃথিবীর মানুষের সুখ যেমন আরাম-আয়েশের চিন্তায় আর সৌন্দর্যের সাধনায় তেমনি কাজের মাধ্যমেই সুখ খুঁজে নেবে ওরা মাটির ওপরের মানুষের অপূর্ব সৌন্দর্য আর নিচের মানুষের আলোর অভাবে পাণ্ডুর ভাব দুটোই এবার যুক্তিযুক্ত মনে হলো আমার কাছে।

'মানুষের বিরাট বিজয়ের যে-চিন্তা করেছিলাম সেটা একটু অন্য রূপ নিল মনে। আমি যে-ধারণা করেছিলাম, নৈতিক শিক্ষা ও সাধারণ সমবায়ের ভিত্তিতে এই বিজয় এসেছে, তা ভুল তার পরিবর্তে দেখলাম নিখুঁত বিজ্ঞানের শক্তিতে শক্তিমান এক খাঁটি অভিজাততন্ত্র। দেখলাম এখানকার কল-কারখানা পদ্ধতির একটা যুক্তিগ্রাহ্য পরিণতি। এটা শুধু একটা প্রাকৃতিক বিজয় নয়। বিজয় সমপর্যায়ের মানুষের ওপরেও ইউটোপিয়ান বইয়ের গল্পের মত আমার এমন কোন গাইড ছিল না যে প্রাচীন কৌতূহলোদ্দীপক বস্তুর ইতিহাস বর্ণনা করবে। আমার ব্যাখ্যা হয়তো একেবারেই ভুল তবু এখনও মনে হয়, ওটাই কিছুটা সঙ্গত ব্যাখ্যা ছিল কিন্তু আমার কল্পনার এই সুষম সভ্যতাও নিশ্চয় অনেক আগেই পার হয়ে এসেছে তার চরমোৎকর্ষ। এখন পা বাড়িয়েছে ধ্বংসের দিকে। পুরোপুরি নিরাপত্তার কারণে ওপরের পৃথিবীর লোকেরা ধীরে ধীরে হারিয়েছে বংশোচিত মর্যাদা ফলে জন্ম নিয়েছে বেঁটে, দুর্বল আর নির্বোধ মানুষ ইতিমধ্যে এসব ব্যাপার আমার কাছে একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে মাটির নিচের অধিবাসীদের সম্বন্ধে অবশ্য এখনও কিছু জানি না। ওপরের সুন্দর মানুষদের বলে "ইলয়"।

আর নিচেরগুলোকে "মরলক"। মরলকদের যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়, ইলয়দের তুলনায় পরিবর্তনের মাত্রা তাদের মধ্যে অনেক বেশি।

'তারপরে মনে এল অস্বস্তিকর কিছু সন্দেহ। আমি নিশ্চিত, মরলকেরাই নিয়ে গেছে টাইম মেশিন কিন্তু কেন? আর ইলয়রাই যদি প্রভু হয় তাহলে তারা মেশিনটা পুনরুদ্ধার করে আমাকে দিল না কেন? আর অন্ধকার দেখলেই এত ভয় পায় কেন তারা? উইনাকে মাটির নিচের জগৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম আবার আমাকে হতাশ হতে হলো। প্রথমে সে বুঝতেই পারল না আমার প্রশ্ন যখন বুঝল, উত্তর দিতে চাইল না। এমন ভাবে কাঁপতে লাগল যেন সহ্য হচ্ছে না বিষয়টা। আমি যখন চাপ দিতে লাগলাম উত্তর দেয়ার জন্যে, একটু বোধহয় কর্কশই হয়ে গেল চাপটা। কেঁদে ফেলল সে নিজের কথা বাদ দিলে স্বর্ণযুগে ওটাই আমার দেখা প্রথম এবং শেষ কান্না। সাথে সাথেই মরলকদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা বাদ দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলাম উইনার কান্না থামানর। খুব জাঁক করে দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বাললাম। দেখতে দেখতে হেসে উঠল সে। আনন্দে হাততালি দিতে লাগল।'

নয়

মরলক

'আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন, নতুন সূত্র পেয়ে যথার্থ সমাধানটা বের করতে আমার দু'দিন সময় লেগে গেল। বিবর্ণ শরীরগুলো দেখে বিচিত্র একটা সঙ্কুচিত ভাব জাগল মনে। প্রাণীবিদ্যার যাদুঘরে পোকা বা অন্যান্য জিনিস স্পিরিটে ডুবিয়ে রাখলে যে আধো শাদা একটা রঙ হয় তেমনি গায়ের রঙ তাদের। স্পর্শ করলে গা ঘিন ঘিন করে। আমার সঙ্কুচিত ভাবটা এসেছে মনে হয় ঘৃণা থেকেই। কারণ মরলকদের প্রতি ইলয়দের ঘৃণা এখন যথাযথই মনে হয় আমার।

'পরের রাতে ভালমত ঘুমাতে পারলাম না। হয়তো শরীর কিছুটা খারাপ করেছে বিহ্বলতা আর সন্দেহে অবস্থা কাহিল। দু'একবার ভীষণ ভয় করল আমার। কী কারণে এই ভয় তা জানি না। নিঃশব্দে গেলাম বড়ো হলঘরটায়। চাঁদের আলোয় ঘুমোচ্ছে ছোট্ট মানুষেরা। তাদের সঙ্গে পরম স্বস্তিতে ঘুমাচ্ছে উইনা। ভাবলাম, আর কয়েকদিন পরেই আসবে অমাবস্যা। গাঢ় কালো রাতে বিশ্রী, শাদা বানরের মত জঘন্য প্রাণীগুলো মাটির নিচ থেকে হয়তো বেরিয়ে আসবে দলে দলে অবশ্যম্ভাবী কোন দায়িত্ব যেন এড়িয়ে চলছি এরকম একটা অনুভূতি হলো আমার বুঝলাম, পাতালের রহস্যের মোকাবেলা করতে হবে সাহসের সঙ্গে। তাহলেই কেবল ফিরে পেতে পারি টাইম মেশিন। এখনও রহস্যের মুখোমুখি হতে পারিনি যদি আমার পাশে কেউ একজন থাকত তাহলে অন্যরকম হত ঘটনাটা ভয়ঙ্কর একাকিত্ব আমাকে এমন করে ফেলেছে যে, কুয়োর দেয়াল বেয়ে নিচে নামব তাতেও আতঙ্ক বোধ করলাম আমার অনুভূতি

হয়তো আপনারা বুঝবেন না। কখনও আমার নিজেকে নিরাপদ মনে হত না

'এই অস্থিরতা আর নিরাপত্তাহীনতা মিলে ক্রমেই পিছিয়ে দিতে লাগল আমার অনুসন্ধানের কাজ। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের উচ্চভূমি অঞ্চলে গেলাম জায়গাটার নাম কম্ব উড কম্ব উড পার হয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে যেদিকে ব্যানস্টেড ছিল সেদিকে গিয়ে বিশাল একটা সবুজ প্রাসাদ দেখতে পেলাম এ-যাবৎ যেক'টা প্রাসাদ দেখেছি, সেগুলোর তুলনায় এটা একেবারেই ভিন্ন। সবচেয়ে বড়ো যে-প্রাসাদ বা ধ্বংসস্তূপ দেখেছি, তার চেয়েও বড়ো এটা। প্রাসাদের বাইরের অংশের গঠন প্রাচ্যের স্থাপত্যের মত। বাইরের উজ্জ্বলতা এখনও নষ্ট হয়নি একধরনের চীনামাটির যে নীলাভ-সবুজ একটা রঙ থাকে তেমনি প্রাসাদটার ফ্যাকাসে সবুজ আভাও ঠিকই আছে এখনও চেহারার পার্থক্য দেখে মনে হলো এখনকার কাজ-কর্মও ভিন্ন ধরনের হতে পারে। ভেতরে ঢুকব বলে মনস্থ করলাম কিন্তু বেলা অনেকখানি গড়িয়ে গেছে। সুতরাং অভিযানটা আগামীকালের জন্যে তুলে রেখে লম্বা, ক্লান্তিকর দিনের শেষে উইনার কাছে ফিরলাম।

পরদিন সকালে উপলব্ধি করলাম সবুজ চিনামাটির প্রাসাদের প্রতি আমার কৌতূহল আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভয়ঙ্কর যে-অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে সে-বিষয়ে অনুসন্ধানের কাজ যাতে আরও একদিন এড়িয়ে যেতে পারি তারই ছুতো এটা। সিদ্ধান্ত নিলাম, আর সময় নষ্ট না করে নামতে হবে মাটির নিচে। গ্রানিট আর অ্যালুমিনিয়ামের ধ্বংসস্তূপের পাশে যে-কুয়োটা আছে তার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম পরদিন খুব ভোরে।

'ছোট্ট উইনা আমার সঙ্গে সঙ্গে এল। নেচে নেচে চলল কুয়োর দিকে কিন্তু ঝুঁকে পড়ে যখন উঁকি দিলাম কুয়োতে, ছটফট করতে লাগল সে। ওকে কোলে তুলে নিয়ে বললাম, "বিদায়, উইনা।" চুমো খেয়ে নামিয়ে দিলাম আবার। তারপর প্যারাপেটের ওপর উঠে খুঁজতে লাগলাম হুক। একটু তাড়াহুড়োই করতে লাগলাম পাছে আবার সাহস হারিয়ে ফেলি। প্রথমে বিস্মিত হয়ে আমার কার্যকলাপ দেখল উইনা। তারপর এক বুকফাটা চিৎকার ছেড়ে ছোট ছোট হাতে টানতে লাগল আমাকে ওর প্রতিরোধ আমাকে দুর্বল করে ফেলতে পারে ভেবে একটু নিষ্ঠুরভাবেই ঠেলে সরিয়ে দিলাম ওকে। চলে এলাম একেবারে গর্তের কাছে প্যারাপেটের ওপর দিয়ে দেখলাম ওর বেদনাভরা মুখ ভরসা দেয়ার জন্যে হাসলাম। তারপর মাথা নিচু করে দেখতে লাগলাম নড়বড়ে হুকগুলোর কোনটা ধরা যায়

'প্রায় দু'শো গজ একটা সুড়ঙ্গ বেয়ে নামতে হবে আমাকে। কুয়োর দু'পাশের দেয়ালে ধাতব খিল সাজান রয়েছে সুন্দরভাবে। কিন্তু খিলগুলো আমার চেয়ে অনেক ছোট এবং হালকা এক প্রজাতির প্রাণীর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং খুব তাড়াতাড়িই শ্রান্তি এসে গেল। প্রচণ্ড শ্রান্তি। মাংসপেশীতে টান ধরেছে। আমার ভারে হঠাৎ বাঁকা হয়ে গেল একটা খিল ঝাঁকি খেয়ে আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলাম নিচের মুখ ব্যাদান করা আঁধারে। কিছু সময় এক হাতে ঝুলে থাকলাম। আর কোথাও বিশ্রাম নেয়ার সাহস হলো না হাত আর মেরুদণ্ড ছিঁড়ে পড়তে চাইছে তীব্র ব্যথায়। তবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নেমে চললাম নিচের দিকে। ওপরে

কুয়োর মুখের দিকে তাকালাম গোল একটা নীল চাকতি যেন। একটা তারা চোখে পড়ল। আর গোল কালো একটা জিনিস। উইনার মাথা নিচে মেশিনের পীড়াদায়ক ধপ্ ধপ্ ধপ্ ধপ্ শব্দ ক্রমেই বেড়ে চলেছে ওপরের গোল চাকতির মত গর্তটা ছাড়া চারপাশেই গাঢ় অন্ধকার। আবার যখন ওপর দিকে তাকালাম, উইনাকে দেখা গেল না

'যন্ত্রণাময় একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম আমি মনে হলো নিচের এই পৃথিবী ছেড়ে আবার উঠে যাই ওপরে। কিন্তু মনে এই বিপরীত ভাবনাটা আসা সত্ত্বেও নামা বন্ধ করলাম না। শেষ পর্যন্ত আমার ফুটখানেক ডানপাশে, দেয়ালের গায়ে অস্পষ্টভাবে একটা ছোট গর্ত দেখতে পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ঘুরে ভেতরে ঢুকে পড়লাম সমতল একটা সুড়ঙ্গের মুখ ওটা ইচ্ছে করলে এখানে শুয়ে বিশ্রাম নেয়া যায়। আমার দু'হাতে ব্যথা, অসাড় হয়ে গেছে মেরুদণ্ড। নামার সময়ে প্রতিমুহূর্তে পড়ে যাবার ভয়ে সারা শরীর থরথর করে কেঁপেছে এছাড়া নিশ্ছিদ্র আঁধারে অস্বস্তিকর এক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে চোখে। সুড়ঙ্গে বায়ুপ্রবাহের জন্যে বসানো মেশিনের ধপ্ ধপ্ শব্দের গুঞ্জনে জায়গাটা মুখর

'কতক্ষণ ওখানে শুয়ে ছিলাম জানি না। মুখের ওপর নরম হাতের স্পর্শে আচমকা ঘুম ভেঙে গেল আমার। অন্ধকারে উঠে বসে তাড়াতাড়ি দেশলাই হাতড়িয়ে একটা কাঠি জ্বাললাম দেখলাম ধ্বংসস্তূপে যেমন দেখেছিলাম ওইরকমই শাদা তিনটে প্রাণী ছুটে পালাচ্ছে। অস্বাভাবিক বড়ো বড়ো জ্বলজ্বলে চোখ তাদের। গভীর পানির মাছের মত ওই নিশ্ছিদ্র আঁধারেও ওরা আমাকে দেখতে পেয়েছে সন্দেহ নেই। আর আলো ছাড়া অন্য কিছুতে তাদের ভয় আছে বলেও মনে হয় না। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালিয়ে আশপাশের গর্তে, সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল তারা। সেখান থেকে আমার দিকে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে রইল। অদ্ভুতভাবে জ্বলজ্বল করতে লাগল ওদের চোখ।

'আমি ওদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম কিন্তু, ওপরের পৃথিবীর ভাষার সঙ্গে অনেক পার্থক্য এদের ভাষার। সুতরাং যা বোঝার নিজের চেষ্টায় বুঝতে হবে। অনুসন্ধান বাদ দিয়ে পালানর চিন্তাটা তখনও রয়েছে মাথায়। নিজেকেই বললাম, "না। পালানো চলবে না যে-কাজে এসেছ সেটা আগে কর " সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। আরো বাড়ল মেশিনের শব্দ। দেয়াল শেষ হলে বড় একটা ফাঁকা জায়গা পেলাম। আরেকটা কাঠি জ্বেলে দেখলাম, খিলান করা একটা গুহা যেতে যেতে শেষে মিশে গিয়েছে আঁধারে অবশ্য একটা কাঠির আলোতে যতটুকু দেখা সম্ভব ততটুকুই দেখতে পাচ্ছি আমি

'সব কথা মনে নেই আমার। ধূসর অন্ধকারের মাঝে বড়ো বড়ো মেশিনের মত কিসের সব কালো ছায়া। তার মাঝেই ভূতুড়ে মরলকদের বাস ভারি, গুমোট আবহাওয়া জায়গাটার তাজা রক্তের অস্বাভাবিক দুর্গন্ধ বাতাসে। জায়গাটার মাঝখানে শাদা একটা ছোট ধাতব টেবিল। মনে হলো, খাবার রাখা তার ওপর মরলকরা যে মাংসাশী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। লাল রেস্তোরাঁ মত জায়গাটা দেখে অবাক হয়ে ভাবছি, এটা তৈরি করার মত কোন বড়ো জানোয়ার এখনও কি টিকে আছে! তবে সবকিছুই বড়ো অস্পষ্ট। ভারী গন্ধ, অর্থহীন সব আকৃতি,

ছায়ায় ওৎ পেতে বসে আছে কুৎসিত প্রাণীগুলো। অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে ছুটে আসবে আমার দিকে। কাঠিটা জ্বলতে জ্বলতে আঙুলে ছ্যাঁক লাগতেই ফেলে দিলাম। মাটিতে পড়ে খানিকল সেটা লাল একটা আভার মত।

'এরকম এক অদ্ভুত অভিযানে কী অসহায় অপ্রস্তুত অবস্থাতেই না এসেছি আমি প্রথমে টাইম মেশিনে উঠেছিলামই এক অদ্ভুত ধারণা নিয়ে যে, ভবিষ্যতের মানুষেরা সবকিছুতেই আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত হবে আমি না এনেছি কোন অস্ত্র, ওষুধ কিংবা ধূমপানের সরঞ্জাম। তামাকের অভাবটা থেকে থেকে ভীষণভাবে অনুভব করছি। এমন কি বেশি দেশলাই পর্যন্ত আনিনি আমি। অন্তত পক্ষে একটা ক্যামেরাও যদি আনতাম! মুহূর্তের মধ্যে পাতালের ছবি তুলে নিয়ে পরে অবসরমত সেগুলো পরীক্ষা করতে পারতাম যাই হোক, এখন আমি আঁধারে দাঁড়িয়ে আছি। প্রাকৃতিক অস্ত্র আর শক্তিই সম্বল আমার– হাত, পা এবং দাঁত। আর আছে চারটে দেশলাই।

'যন্ত্রপাতির ভেতর দিয়ে অন্ধকারে এগোনোর সাহস আমার নেই এদিকে হাতের কাঠিটা ফেলে দেবার আগের মুহূর্তে দেখেছি, কমে এসেছে দেশলাইয়ের মজুত। দেশলাই যে জমিয়ে রাখা দরকার, এই পরিস্থিতিতে পড়ার আগে সেটা কখনও উপলব্ধি করিনি। শুধু ওপরের পৃথিবীর মানুষদের একটু অবাক করার জন্যে আমি অর্ধেক বাক্স দেশলাই নষ্ট করেছি। অথচ দেশলাই তাদের কাছে নতুন একটা দেখবার জিনিস ছাড়া আর কিছুই নয়। মাত্র চারটে দেশলাই আছে আর। এমন সময় হঠাৎ একটা হাতের ছোঁয়া অনুভব করলাম। লম্বা লম্বা রোগা আঙুলে নেড়ে দেখছে আমার মুখ। বিচিত্র ধরনের অস্বস্তিকর একটা দুর্গন্ধ পেলাম। মনে হলো ভয়ঙ্কর এই প্রাণীগুলোর একটা পুরো দল ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলছে আমার চারপাশে। কিছু হাত ধীরে ধীরে আমার হাত থেকে দেশলাই কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। আবার কিছু হাত পেছন থেকে কাপড় ধরে টানছে। অদৃশ্য প্রাণীগুলো নেড়েচেড়ে দেখছে আমাকে। সে এক অবর্ণনীয় ব্যাপার। ওদের চলচলন কথাবার্তার কিছুই যে জানি না আমি সেটা নতুন করে মনে পড়ল যত জোরে পারি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম দৌড়ে পালাল ওরা, কিন্তু টের পেলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল আবার। আরও জোরে আঁকড়ে ধরতে লাগল আমাকে। বিচিত্র একধরনের ফিসফিস শব্দ করছে ওরা নিজেদের মধ্যে। ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠলাম আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম আবার। এবারে অতটা ভয় পেল না তারা। ফিরে আসার সময় হাসাহাসির মত একটা শব্দ করতে লাগল। স্বীকার করতে বাধা নেই, সাংঘাতিক আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম আমি আরেকটা কাঠি জ্বেলে পথ দেখে পালাব বলে মনস্থির করলাম কাঠি জ্বাললাম! পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে আগুন ধরিয়ে নিলাম তাতে তারপর ছুটে চললাম সরু সুড়ঙ্গটার দিকে। কিন্তু আলো নিবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সুড়ঙ্গে ঢোকা কঠিন হয়ে দাঁড়াল আমার পক্ষে বাতাসে পাতার মর্মরধ্বনি আর বৃষ্টির মত টুপ টুপ শব্দ করে আঁধারে পেছন পেছন ছুটে আসছে মরলকের দল।

'দেখতে দেখতে অনেকগুলো হাত জড়িয়ে ধরল আমাকে। পরিষ্কার বোঝা

গেল, ওরা আমাকে পেছনে টেনে নিয়ে যেতে চায়। ফস করে আরেকটা কাঠি জ্বেলে ওদের মুখের সামনে দোলাতে শুরু করলাম। আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না কী অমানুষিক সেই চেহারা। চিবুকবিহীন ফ্যাকাসে মুখ আর পাতাবিহীন বড়ো বড়ো গোলাপী-ধূসর চোখ! আলোয় ধাঁধিয়ে গিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে যেন তাকিয়ে আছে সে-চোখ। কিন্তু ওদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকার মত অবস্থা আমার নেই আবার দৌড়ালাম! দ্বিতীয় দেশলাইটা পুড়ে শেষ হয়ে যেতে জ্বাললাম তৃতীয়টা। সুড়ঙ্গের মুখের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সেটাও প্রায় শেষ হয়ে গেল। শুয়ে পড়লাম কিনারায়, কারণ পাম্প মেশিনের প্রচণ্ড শব্দে মাথা ঝিমঝিম করছে আমার। পাশে হাতড়াতে লাগলাম হুকের খোঁজে। পেছন থেকে আমার পা টেনে ধরল ওরা। আমিও পা ছাড়ানর জন্যে ভীষণ টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করলাম। শেষ দেশলাইটা জ্বাললাম। সঙ্গে সঙ্গেই নিবে গেল সেটা। কিন্তু ততক্ষণে ওঠার খিল হাতে পেয়ে গেছি। ভীষণভাবে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে একসময় মরলকদের কবল থেকে মুক্ত হলাম। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত উঠতে লাগলাম কুয়োর দেয়াল বেয়ে ওপরদিকে। কিন্তু খুদে এক পিশাচ কয়েক ধাপ পর্যন্ত উঠে এল আমার পেছন পেছন। জয়ের চিহ্ন হিসেবে শেষ পর্যন্ত একটা জুতো খসিয়ে নিল সে আমার পা থেকে

'যেন অনন্তকাল ধরে উঠছি তো উঠছিই। শেষ বিশ-ত্রিশ ফুট তীব্র বমি বমি একটা ভাব পেয়ে বসল। সবচেয়ে অসুবিধা হলো খিলগুলো ধরে রাখতে। শেষ কয়েকগজ উঠলাম মারাত্মক ক্লান্তির বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে। অনেকবার ঘুরে উঠল মাথা, মনে হলো আমি পড়ে যাচ্ছি। যাই হোক, অবশেষে কোনমতে বেরুলাম কুয়ো থেকে। টলতে টলতে ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে এলাম চোখ ধাঁধানো সূর্যালোকে। মুখ থুবড়ে দড়াম করে পড়ে গেলাম। আহ! মাটির গন্ধও কী মিষ্টি। বুকটা হালকা হয়ে যাচ্ছে। তারপর দেখলাম আমার হাতে কানে চুমো খাচ্ছে উইনা। কথা বলছে বেশ কিছু ইলয়। কিছুক্ষণের জন্যে জ্ঞান হারালাম আমি।'

দশ

রাত নামে

মনে হচ্ছে, এখন আমার অবস্থা আগের চেয়ে আরও খারাপ। যে-রাতে টাইম মেশিন অদৃশ্য হয় সেরাতের তীব্র মানসিক যন্ত্রণার পর ইতিমধ্যে ভেবেছিলাম, শেষ পর্যন্ত পালানর একটা পথ বেরিয়ে যাবেই। কিন্তু নতুন এই আবিষ্কারগুলোর পর সে-আশাও অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ভেবেছিলাম, ছোট্ট মানুষগুলোর শিশুসুলভ সরলতা আর অজানা যে-শক্তির বাধাটুকু আছে সেগুলো অতিক্রম করার কায়দাটা রপ্ত করে নিলেই হবে। কিন্তু এখন যোগ হয়েছে এক নতুন উপসর্গ অমানুষিক, ভয়ঙ্কর, গা বমি বমি করা চেহারার মরলকেরা। সহজাত প্রবৃত্তিবশে ওদের দেখে গা ঘিনঘিন করেছে আমার। একজন মানুষ গর্তে পড়ে গেলে তার

যেমন লাগে তেমনি লাগছিল আমার মরলক দেখার আগে চিন্তার বিষয় ছিল শুধু গর্তটাই। কোন মতে বেরিয়ে আসতে পারলেই হলো। কিন্তু এখন আমার অবস্থা হয়েছে ফাঁদে পড়া পশুর মত। কাছে পিঠেই আছে শত্রু। এসে পড়বে যে-কোন মুহূর্তে।

যে-শত্রুর ভয় করছিলাম আমি, শুনলে আপনারা অবাক হবেন। ভয় অমাবস্যার আঁধারকে। এই অন্ধকার রাত সম্পর্কে প্রথমেই আমাকে সাবধান করার চেষ্টা করেছিল উইনা। তখন অবশ্য ওর কথা ছিল আমার কাছে দুর্বোধ্য। আসন্ন অন্ধকার রাত কী অর্থ বহন করে তা বোঝা আর খুব কঠিন নয় এখন। ক্ষীণকায় হয়ে এসেছে চাঁদ। অন্ধকারের প্রহর বাড়ছে প্রতি রাতে। ওপরের পৃথিবীর ছোট্ট মানুষগুলো কেন আঁধারকে ভয় পায় তার কিছুটা বুঝতে পারি এখন। অমাবস্যার রাতে কী শয়তানিটা করে এই মরলকেরা অনুমান করতে চেষ্টা করছি। আমার দ্বিতীয় ধারণাও যে পুরোপুরি ভুল সে-ব্যাপারে এখন আমি নিশ্চিত। একসময় ওপরের পৃথিবীর মানুষেরা ছিল অভিজাত। মরলকেরা তাদের যন্ত্রপাতি চালাত ফাইফরমাশ খাটত। কিন্তু সেটা বহুদিন আগের কথা। কালে কালে যে বিবর্তন হয় মানুষের, হয়তো সেটা শুরু হয়েছে অথবা বিবর্তন ঘটে গিয়ে নতুন একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে এদের। কারলোভিঞ্জ্যান রাজাদের মত ধ্বংস হয়ে গেছে ইলয়রা। আর কিছু নেই তাদের তুচ্ছ সৌন্দর্যটুকু ছাড়া। বংশপরম্পরায় ভূগর্ভবাসী মরলকদের কাছে যখন থেকে আলো অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন থেকে পৃথিবীটা ইলয়দের দখলেই আছে। টিকে থাকার পুরানো তাগিদে মরলকেরা তাদের জামাকাপড় তৈরি করে দেয়। ব্যবহারিক প্রয়োজনগুলোও মেটায় তারা। ঘোড়া যেমন দাঁড়িয়ে পা ঠোকে, কিংবা মানুষ যেমন পশু শিকার করে আনন্দ পায়, তেমনি স্বাভাবিকভাবেই কাজগুলো করে তারা। এসব কাজ করার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে কি হবে, অভ্যাসটা তখনও রয়ে গেছে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি নিশ্চিতভাবেই বদলেছে। এতদিনের অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়ার সময় এগিয়ে আসছে দ্রুত। অনেক আগে, হাজার হাজার বছর আগে মানুষ তার ভ্রাতৃপ্রতিম মানুষের ওপর অত্যাচার করত। কালের বিবর্তনে সেই অত্যাচারিত ভাইটি এখন অন্যরূপ ধরে ফিরে আসছে পুরানো একটা অধ্যায় ইতিমধ্যেই নতুন করে শিখতে শুরু করেছে ইলয়রা ভয়ের সঙ্গে আবার নতুন করে পরিচয় হচ্ছে তাদের। হঠাৎ পাতালে দেখা সেই মাংসের কথা মনে হলো। একটু অদ্ভুতভাবেই মনে এল কথাটা। চিন্তা করতে করতে কথাটা মাথায় এসেছে তা নয়। একেবারে আলাদাভাবে হঠাৎ মনে হয়েছে। কেন এই চিন্তা এল, বুঝতে চেষ্টা করলাম। হালকা একটা আভাসও যেন পেলাম। কিন্তু ওই পর্যন্তই পরিষ্কার মনে পড়ল না কিছুই।

যাই হোক, রহস্যময় সেই ভয়ের সামনে যতটা অসহায় ইলয়রা, আমি ততটা নই। মানুষের উন্নতির প্রাথমিক যুগ, যখন ভয় নিচ্ছে বিদায়, রহস্যময় বস্তু আর আতঙ্কিত করতে পারে না মানুষকে, সেই কাল থেকে এসেছি আমি নিজেকে অন্তত রক্ষা করতে পারব। সময় নষ্ট না করে অস্ত্র জোগাড় করতে হবে আর নিরাপদ একটা জায়গা দরকার ঘুমানর জন্যে রাতের পর রাত প্রাণীগুলোর

আওতার মধ্যে ঘুমিয়েছি ভেবে যেটুকু সাহস হারিয়েছি তা আবার উদ্ধার করা সম্ভব নিরাপদ জায়গা পেলে সেই সাহস নিয়ে আবার মুখোমুখি হব বিচিত্র এই পৃথিবীর। সত্যি বলতে কি, নিরাপদ জায়গা না পেলে ঘুমাতেই পারব না আর। ইতিমধ্যে মরলকেরা কতভাবে না দেখেছে আমাকে। আতঙ্কে গা শিউরে উঠল।

'বিকেলে টেমসের উপত্যকায় ঘোরাঘুরি করলাম। দুর্গম সুরক্ষিত কোনকিছুই চোখে পড়ল না আমার যেসব বিল্ডিং আর গাছপালা দেখলাম কোনটাই মরলকের অগম্য মনে হলো না। বেয়ে ওটা বা নামার ওরা কতখানি পাকা সে তো ওদের কুয়ো দেখেই বুঝেছি। সবুজ চিনামাটির প্রাসাদের লম্বা চূড়া আর ঝকমকে মসৃণ চেহারাটা ভেসে উঠল মনে সন্ধ্যায় উইনকে ছোট্ট একটা শিশুর মত কাঁধে বসিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে রওনা দিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম দূরত্বটা সত্ত-আট মাইল হবে কিন্তু আসলে আঠারো মাইলের কাছাকাছি। কুয়াশাচ্ছন্ন এক বিকেলে দেখেছি ওটা, যখন দূরত্ব কম মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক আজ সে-পরিস্থিতি নেই যে-জুতো পরে আছি তা বাড়িতে পরার জন্যে আরামদায়ক হলেও এখন একটার গোড়ালি গেছে ঢিলে হয়ে সোলের ভেতর দিয়ে অনবরত একটা কাঁটা ফুটছে পায়ে ফলে প্রায় খোঁড়া হয়ে গেছি আমি ফ্যাকাসে হলুদ রঙের আকাশের গায়ে লেপটানো প্রাসাদটার কালো ছায়া যখন চোখে পড়ল তার অনেক আগেই প্রায় নেমে এসেছে রাত।

'উইনকে যখন কাঁধে তুলে নিই, প্রথমে খুব খুশি হলো সে কিন্তু নামতে চাইল একটু পরেই দৌড়াতে লাগল পাশাপাশি মাঝেমাঝেই এদিক-সেদিক ছুটে গিয়ে ফুল তুলে এনে ভরতে লাগল আমার পকেটে। আমার পকেটগুলো তার কাছে এক আশ্চর্যের জিনিস শেষমেশ সিদ্ধান্তে এসেছে, ওগুলো আসলে ফুল সাজানর জন্যে বানানো অদ্ভুতগোছের ফুলদানি অন্তত ওগুলোকে ফুলদানি হিসেবেই ব্যবহার করে ও হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে! জ্যাকেট বদলাতে গিয়ে পেয়েছি...'

একটু থামলেন টাইম ট্রাভেলার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করলেন শুকনো, বিবর্ণ দুটো ফুল। বড়ো শাদা ম্যালোর মত দেখতে। নিঃশব্দে ফুলদুটো রাখলেন তিনি ছোট টেবিলটার ওপর। তারপর আবার শুরু করলেন গল্প।

'ঘনিয়ে আসতে লাগল সন্ধ্যা, পাহাড় পেরিয়ে আমরা এগোলাম উইম্বলডনের দিকে। ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল উইনা তার পরিচিত ধূসর পাথরের বাড়িটাতে ফিরে যেতে চাইল বার বার কিন্তু আমি ওকে দেখতে লাগলাম দূরের সবুজ চিনামাটির প্রাসাদের চূড়াগুলো। বোঝাতে চেষ্টা করলাম, নিরাপদ একটা জায়গা খুঁজতেই ওখানে যাচ্ছি আমরা। অন্ধকার নামার ঠিক পূর্বমুহূর্তে চারদিকে যে গভীর একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে, নিশ্চয় ত খেয়াল করেছেন? গাছের পাতা পর্যন্ত সে-সময় নড়ে না। সন্ধ্যার ওই শান্ত মুহূর্তটিতে সবসময় এক ধরনের আশা জাগে আমার মনে দিকচক্রবালের কাছে সূর্যাস্তের রঙমাখা কয়েকটি রেখা ছাড়া নির্মেঘ সুদূর আকাশ প্রায় শূন্য সেরাতে মনে আশার বদলে জাগল ভয়। সেই অন্ধকারে আমার শান্ত বোধগুলো অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মনে হলো, পায়ের নিচে মাটির ফাঁপা গহ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত পরিষ্কার বুঝতে পারছি যেন মাটি ভেদ করে

দেখতে পাচ্ছি মরলকদের। এখানে-সেখানে দৌড়াদৌড়ি করছে। অপেক্ষায় আছে, কখন নামবে অন্ধকার। তাদের গর্তে ঢুকে আমি আসলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি, উত্তেজিত মাথায় এ-কল্পনাও এল বার বার ভাবলাম, ওরা আমার টাইম মেশিন নিয়ে গেছে কেন?

'চুপচাপ এগোলাম আমরা। গোধূলি পেরিয়ে রাত এল আকাশের পরিষ্কার নীল রঙ হয়ে এল ফ্যাকাসে একটা একটা করে তারা ফুটতে শুরু করল অস্পষ্ট হয়ে এল আশপাশের সবকিছু। গাছপালা কালো রঙ ধারণ করল। শ্রান্ত হয়ে পড়ল উইনা। ক্রমেই বেড়ে চলল ওর ভয়। ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কথা বলে চললাম। আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম গায়ে আঁধার আরও গাঢ় হলে আমার কাঁধে মুখ চেপে, চোখ বুজে শক্ত করে আমার গলা জড়িয়ে ধরে রইল উইনা। বড়ো একটা ঢাল বেয়ে উপত্যকায় নেমে ছোট একটা নদী পার হলাম। উঠলাম উপত্যকার আরেক পাশে। বেশ কিছু ঝাড়ি দেখলাম। নিঝুম। ভেতরে সবাই ঘুমাচ্ছে একটা ফনের (গ্রীক দেবতা। মানুষের মত, কিন্তু কান, শিং, লেজ আর পা ছাগলের) মূর্তি দেখলাম। একই ধরনের মূর্তি দেখলাম আরও কয়েকটা। একটারও মাথা নেই অ্যাকেইশা গাছ দেখলাম এখানেও। এখন পর্যন্ত একটা মরলকও চোখে পড়েনি সবে রাত নেমেছে। চাঁদ ওঠার আগের গাঢ় আঁধারের প্রহর আসেনি এখনও

'পরের পাহাড়টার পাশে বিস্তৃত একটা ঘন কালো বন দেখা গেল ইতস্তত করলাম, ঢুকব কি ঢুকব না। ডানে বাঁয়ে দু'পাশেই বিস্তৃত বনটা। কোনদিকেই শেষ দেখলাম না ক্লান্তি লাগছে, বিশেষ করে পা হয়ে গেছে ক্ষতবিক্ষত উইনাকে সাবধানে নামিয়ে নরম ঘাসের ওপর বসলাম। সবুজ চিনামাটির প্রাসাদের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। পথ ভুল করলাম না তো? সামনে ঘন বন। কী লুকিয়ে আছে ওর ভেতর? গাছের জটপাকানো ডালের ভেতর দিয়ে একটা তারাও দেখা যাচ্ছে না ভয়ঙ্কর কিছু ওত পেতে আছে কিনা তাও বোঝা সম্ভব নয়। এই ভয়ঙ্করের চিন্তা আমি করতে চাই না। এখন ভেতরে ঢুকলে শেকড়-বাকড়ে হোঁচট খেয়ে কিংবা গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে মরতে হবে। সারাদিনের উত্তেজনার পর চরম ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। সুতরাং বনে আর ঢুকছি না। পাহাড়ের ওপরেই কাটিয়ে দেব রাতটা।

'উইনা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দেখে খুশি হলাম। ওকে ভালভাবে মুড়ে দিলাম জ্যাকেট দিয়ে। চুপচাপ পাশে বসে রইলাম চাঁদ ওঠার অপেক্ষায় শান্ত, একেবারেই শূন্য পাহাড়। কিন্তু কালো বনের মধ্যে কোন প্রাণীর চলাফেরার আভাস পাওয়া যাচ্ছে থেকে থেকেই পরিষ্কার আকাশ মাথার ওপর ছড়িয়ে আছে তারা। তারার মিটি মিটি আলো এক ধরনের বন্ধুত্বের আনন্দ দিচ্ছে পুরানো নক্ষত্রপুঞ্জের একটাও নেই আকাশে। কিন্তু ছায়াপথ পুরাকালের মতই এখনও ধূলিকণার মত অজস্র তারার সমাহারে উজ্জ্বল আলোক বিছিয়ে আছে রশ্মির মত। দক্ষিণ দিকে (আমার তাই মনে হলো) একেবারেই অচেনা উজ্জ্বল লাল একটা তারা দেখলাম। আমাদের সবুজ লুব্ধক নক্ষত্রের চেয়েও চমৎকার। আলোর এইসব স্ফুলিঙ্গের মাঝে স্থির প্রশান্ত আলো নিয়ে পুরানো বন্ধুর মত

তাকিয়ে আছে একটা উজ্জ্বল গ্রহ।

'তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের বিপদ, পার্থিব জীবনের সমস্ত গুরুভার– সব একেবারে তুচ্ছ মনে হলো আমার ওগুলোর অসীম দূরত্বের কথা ভাবলাম ভাবলাম ধীরে ধীরে সুদূর অতীত থেকে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে ওগুলোর যাত্রার কথা। পৃথিবীর মেরুর অয়নচক্রের বিরাট ব্যাপারটা মনে হলো। যত বছর পার হয়েছি তার মধ্যে মাত্র চল্লিশ বার সম্পন্ন হয়েছে এই আবর্তন কিন্তু এই সামান্য পরিবর্তনের ফলেই বদলেছে মানুষের কাজকর্ম, যাবতীয় ঐতিহ্য, দুরূহ সংগঠন, জাতিত্ব, ভাষা, সাহিত্য, উদ্যম এমন কি যে-মানুষের স্মৃতি আমি বয়ে এনেছি মস্তিষ্কে, সেই মানুষ পর্যন্ত উধাও হয়ে গেছে পরিবর্তে আছে কী? অভিজাত পূর্বপুরুষের স্মৃতি পর্যন্ত ভুলে বসে থাকা কিছু দুর্বল প্রাণী আর এক অদ্ভুত শাদা জানোয়ার যাদের দেখে আমি আতঙ্কিত। যে-দুই প্রজাতি আছে তাদের ভেতরে বিদ্যমান ভয়ের প্রাচীরের কথা মনে হলো হঠাৎ পরিষ্কার বুঝলাম, আমার অন্তরাত্মা পর্যন্ত শিউরে উঠে বুঝতে পারল, যে-মাংসগুলো দেখেছি, সেগুলো কিসের মাংস। কী ভয়ঙ্কর! উইনার দিকে তাকালাম ঘুমিয়ে আছে তারার নিচে ওর শাদা মুখটাকেও তারার মতই লাগছে। তৎক্ষণাৎ বাদ দিলাম ওই চিন্তা।

'দীর্ঘ সেই রাতে যতটা পারা যায় দূরে সরিয়ে রাখলাম মরলকের চিন্তা। নতুন এই সৌরমণ্ডলে পুরানো নক্ষত্রপুঞ্জের চিহ্ন খোঁজার চেষ্টায় কাটিয়ে দিলাম সময়টা। দু'এক টুকরো হালকা মেঘ ছাড়া পরিষ্কার আকাশ। দু'একবার যে ঘুমে ঢলে পড়িনি তা নয়। একসময় অপেক্ষার পালা শেষ হলো। বর্ণহীন আগুনের আভার মত হালকা হয়ে এল পুব আকাশ পুরানো চাঁদ উঠল। ক্ষীণ, জীর্ণ, শাদা এর পরপরই চাঁদের আলো ম্লান করে দিয়ে আবির্ভাব হলো উষার। কোন মরলকই আসেনি রাতে পাহাড়ের ওপরে দেখিনি ওদের। নতুন দিন নতুন সাহস জোগাল। মনে হলো, খামোকাই ভয় পেয়েছি আমি। দাঁড়িয়ে দেখি, যে-পায়ের জুতোর হিল খুলে গেছে সে-পায়ের গাঁট ফুলে উঠেছে। তীব্র ব্যথা করছে গোড়ালি। আবার বসলাম। জুতো খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

'উইনাকে জাগালাম। বনের ভেতর ঢুকলাম আমরা। সবুজ, চমৎকার বন। অথচ রাতে কালো, ভয়াবহ লাগছিল। নাস্তা করার মত কিছু ফল পাওয়া গেল একটু পরেই আরও লোকজনের দেখা পাওয়া গেল। সূর্যালোকে হাসছে, নাচছে যেন আর কখনও রাত নামবে না আরেকবার মনে পড়ল সেই মাংসের কথা। এখন আমি নিশ্চিত, ওটা কিসের মাংস সুবিশাল মানবপ্রজাতির শেষ স্বাক্ষর এই নিস্তেজ মানুষগুলোর জন্যে অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটা করুণা অনুভব করলাম। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, অনেক আগে যখন মানব সভ্যতার অধঃপতন শুরু হয় তখন কোন এক সময় কমে আসে মরলকদের খাবার তখন তারা সম্ভবত ইঁদুর ও ওই জাতীয় কীট-পতঙ্গ খেয়ে জীবন ধারণ করত মানুষ তখনও তাদের খাবারের তালিকার মধ্যে পড়েনি। কিন্তু মানুষের মাংসের প্রতি তাদের অনীহা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে আসেনি ফলে মানুষের এইসব অমানুষ সন্তানের একদিন– ! এটার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম। আমাদের তিন-

চার হাজার বছর আগের নরমাংসভোজী মানুষের সঙ্গে এদের অনেক ব্যবধান। অনেক নিম্নমানের এরা। যাক গে। আমার অত মাথা ঘামাবার দরকারটা কী? নাদুসনুদুস গবাদি পশুর সঙ্গে খুব একটা পার্থক্য নেই ইলয়দের। পেলে-পুষে এদের বড়ো করে মরলকেরা। তারপর একসময় ধরে ধরে খায়। এই তো, চিন্তা-ভাবনা কিছু নেই, উইনা নেচে চলেছে আমার পাশে।

'এটা মানুষের স্বার্থপরতারই শাস্তি ভেবে দূরে সরিয়ে রাখলাম আতঙ্ক। এক মানুষের পরিশ্রমের ওপর গড়ে উঠেছে আরেকজনের সুখের ইমারত। প্রয়োজনই ছিল তার প্রথম ও শেষ কথা, একমাত্র অজুহাত। একসময় সমস্ত প্রয়োজন মিটে গেছে তাদের। ধ্বংসোন্মুখ এই হতভাগ্য অভিজাততন্ত্রের প্রতি কার্লাইলের মত একধরনের ঘৃণা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। বুদ্ধিবৃত্তির অধঃপতন যতখানিই হোক, চেহারাটা এখনও মানুষের মতই আছে ইলয়দের। এই চেহারা দেখে মানুষ হিসেবে আমার সহানুভূতি জাগতে বাধ্য। তাদের অধঃপতন আর ভয়ের কিছুটা দায়ভাগও নিতে বাধ্য হয়েছি আমি।

'কোন্ পথে অগ্রসর হতে পারি সে-সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা এখনও আমার নেই। প্রথম কাজ, থাকার জন্যে কোন নিরাপদ জায়গা খুঁজে বের করা। তারপর দরকার পাথরের বা ধাতব কোন অস্ত্র। এটাই আসলে খুব জরুরী। তারপর আমার দরকার– আগুন। একটা মশাল তৈরি করতে পারব তাহলে। এই অস্ত্র বেশ ভাল কাজ দেবে মরলকদের বিরুদ্ধে। সব ব্যবস্থা হলে শাদা স্ফিংক্সের বেদীর ব্রোঞ্জের দরজা ভাঙার একটা কৌশল বের করে নিতে হবে। পুরানো একটা র‍্যামজাতীয় কিছু পেলে হত। আমার মনে হয় উজ্জ্বল আলো সঙ্গে নিয়ে ওই দরজা দিয়ে যদি ঢুকতে পারি একবার তাহলে উদ্ধার করতে পারব টাইম মেশিনটা। পালাতেও পারব তাহলে। টাইম মেশিন খুব বেশি দূরে নিয়ে যাবার মত শক্তি নেই মরলকদের। উইনাকে আমাদের নিজেদের কালে নিয়ে যাব। এইসব প্ল্যান ভাঁজতে ভাঁজতে রওনা দিলাম সেই বিল্ডিংয়ের দিকে, যেখানে থাকব বলে মনস্থ করেছি।'

এগারো

সবুজ চীনামাটির প্রাসাদ

'সবুজ চীনামাটির প্রাসাদে যখন পৌঁছলাম তখন দুপুর। প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া অবস্থা প্রাসাদের। কেউ নেই কোথাও। মরচে ধরা ধাতব ফ্রেম থেকে খুলে পড়ে গেছে বড়ো বড়ো সবুজ কাচের শিট। শুধু দু'একটা চোখা টুকরো অবশিষ্ট আছে জানালায়। ঘাসে ছাওয়া একটা ঢালের ওপর অবস্থিত প্রাসাদটা। ঢোকার আগে উত্তর-পূর্বদিকে একটা নদীর মোহনা, খাঁড়িও হতে পারে, দেখে খুব অবাক হয়েছি। এই জায়গাতেই নিশ্চয় একসময় ওয়াণ্ডসওয়ার্থ বা ব্যাটারসী ছিল। হঠাৎ ভাবলাম, সমুদ্রের জীবিত প্রাণীদের ভাগ্যে না জানি কী ঘটেছে বা ঘটছে। তবে

এ-চিন্তা কেন এল মাথায়, জানি না।

'পরীক্ষা করে বুঝলাম, প্রাসাদটা আসলেই চীনামাটির। বাইরের দিকে অচেনা একধরনের লেখা খোদাই করা রয়েছে দেখলাম। বোকার মত ভাবলাম, উইনা এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। আসলে সাহায্য তো দূরের কথা, লেখা জিনিসটাই ওর মাথায় ঢোকেনি কখনও। উইনা যতটা না স্বাভাবিক মানুষের মত, আমার কল্পনায় ছিল তার চেয়ে বেশি। ওর আবেগ ছিল মানুষের মত, হয়তো সে-কারণেই।

'দরজা ভেঙে খুলে পড়েছে। এখনকার বিল্ডিংগুলোর রীতিমাফিক হলঘরের বদলে একটা লম্বা গ্যালারি পাওয়া গেল। দু'পাশের জানালা দিয়ে আলো ঢুকে ভেতরের আঁধার দূর করেছে। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হলো– যাদুঘর। টাইল দেয়া মেঝেতে পুরু ধুলো। উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন সব জিনিসও ধুলোর ধূসর আবরণে ঢাকা পড়ে আছে। ঘরটার মাঝখানে, যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, বিশাল একটা কঙ্কালের নিচের অংশ রয়েছে সেখানে। পা বাঁকা দেখে বুঝলাম, এটা বিলুপ্ত মেগাথেরিয়াম গোত্রের কোন প্রাণী হবে। খুলি আর দেহের ঊর্ধ্বাংশের হাড় পাশে পুরু ধুলোর মধ্যে পড়ে আছে। কঙ্কালটার এক জায়গায় ছাদের ফুটো দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। আরেক জায়গায় ব্রনটোসরাসের বিশাল কঙ্কাল দেখলাম। সন্দেহ নেই, এটা যাদুঘর। দু'পাশে ঢালু তাক। সেখানকার ধুলো পরিষ্কার করে আমাদের যুগের মত কিছু কাচের পাত্র পেলাম। পাত্রগুলো নিশ্চয় এয়ারটাইট, কারণ ভেতরের জিনিসগুলো যেমন ছিল তেমনি আছে।

'পরিষ্কার বোঝা গেল, দক্ষিণ কেনসিংটনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি আমি। এখানে প্যালান্টোলজিকাল সেকশন ছিল। অতি চমৎকার জীবাশ্ম এগুলো, কোন সন্দেহ নেই। অবধারিত যে ধ্বংসক্রিয়া তা কিছুটা থেমে আছে। ব্যাকটেরিয়া আর ছত্রাক বিলুপ্ত হওয়াতে ধ্বংস-প্রক্রিয়া তার নিরানব্বই শতাংশ শক্তিই হারিয়েছে। তবু ওই যে বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট আছে, ওটা যত আস্তেই হোক, নিশ্চিতভাবেই অব্যাহত রেখেছে ধ্বংসের প্রক্রিয়া। ছোট মানুষের দুষ্প্রাপ্য কিছু জীবাশ্ম পেলাম। ভেঙেচুরে গেছে। কোনটা আবার তার দিয়ে বেঁধে রাখা। আর কিছু কিছু নিয়ে গেছে কোন প্রাণী। মনে হলো, মরলকদের কাজ। চারদিকে ভীষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। পুরু ধুলোতে আমাদের পায়ের ছাপ খুব একটা বসেনি। তীক্ষ্ণ কাঁটাঅলা একটা সামুদ্রিক শামুক নিয়ে ঢালু কাচের পাত্রে গড়িয়ে গড়িয়ে খেলছিল উইনা। কাছে এসে চুপচাপ আমার একটা হাত ধরে পাশে দাঁড়াল।

'একটা ইনটেলেকচুয়াল যুগের এই প্রাচীন সৌধে এসে প্রথমটায় এত আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, এগুলো কাজে লাগাবার সম্ভাবনা বা অন্য কোনপ্রকার চিন্তা মাথায় ঢুকল না। এমনকি টাইম মেশিনের কথা পর্যন্ত ভুলে থাকলাম কিছুক্ষণ।

'সবুজ চীনামাটির প্রাসাদটির আয়তন দেখে মনে হয়, এটাতে প্যালান্টোলজির গ্যালারি ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে। ইতিহাসের গ্যালারি থাকতে পারে। লাইব্রেরি থাকাও বিচিত্র নয়। আমার কাছে, অন্তত বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীনকালের প্রাসাদের চেয়ে একটা লাইব্রেরি অনেক

আনন্দ বয়ে আনবে। আরেকটা ছোট গ্যালারির সন্ধান পেলাম। আড়াআড়িভাবে চলে গেছে প্রথমটার দিকে। এটা নানারকম খনিজ পদার্থের নমুনায় ভর্তি। গন্ধকের একটা ঢেলা দেখে চট করে মনে পড়ল বন্দুকের বারুদের কথা। কিন্তু সোরা দেখতে পেলাম না কোথাও। কোন ধরনের নাইট্রেটও নেই। বহুকাল আগেই গলে শেষ হয়ে গেছে সেসব। তবুও গন্ধকের কথা মাথায় ঢুকে এক ধরনের চিন্তায় ভরে থাকল মন। এই গ্যালারির অন্যান্য জিনিসগুলো, এ-পর্যন্ত যত জিনিস দেখলাম তার তুলনায় সবচেয়ে ভালভাবে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু এসবে আমার আগ্রহ খুব কম, কারণ আমি খনিবিদ্যার বিশেষজ্ঞ নই। স্তম্ভ পরিবেষ্টিত একেবারে ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটা স্থান ঘুরে প্রথম ঘরটার সোজাসুজি আরেকটা ঘরে গেলাম। এটা ন্যাচারাল হিস্ট্রির জিনিসপত্রে বোঝাই। কিন্তু প্রতিটা জিনিস বহু আগেই তাদের পরিচিতি হারিয়েছে। কুঁচকে যাওয়া কালো কিছু বস্তু অবশিষ্ট আছে। এগুলো একসময়ের স্টাফ করা পশু, শুকনো মমি। মমিগুলো জারে স্পিরিটে ডোবানো ছিল। কিছু লতাপাতা পরিণত হয়েছে বাদামী ধুলোতে। আরেকটা বিশাল গ্যালারিতে প্রবেশ করলাম। আলো অস্বাভাবিকরকম কম সেখানে। যেদিক দিয়ে ঢুকেছি সেদিক থেকে একটু ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে মেঝে। একটু পরপরই সিলিং থেকে ঝোলানো শাদা শাদা গোলক। অনেকগুলোই ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। বোঝা যায় গ্যালারিটা কৃত্রিমভাবে আলোকিত ছিল। এতক্ষণে মনমত একটা জায়গা পেয়েছি। দু'পাশে বিশাল বিশাল যন্ত্র। সবগুলোতেই মরচে ধরেছে ভীষণভাবে। ভেঙে পড়েছে অনেকগুলো। কিন্তু কিছু কিছু এখনও ঠিকঠাক মতই আছে। আপনারা জানেন যন্ত্রপাতির ব্যাপারে আমার একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে। এসবের মাঝে কিছুটা সময় কাটাব ঠিক করলাম। যন্ত্রপাতির মধ্যে যে ধাঁধার আনন্দ তার টানেই থাকলাম। এগুলো সম্বন্ধে ক্ষীণ একটা ধারণা করতে পারছি। ভাবলাম মেশিনগুলোর ধাঁধার জট যদি খুলতে পারি তাহলে এমন একটা শক্তি অর্জন করব যা মরলকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে।

হঠাৎ উইনা আমার একেবারে কাছে ঘেঁষে এসে চমকে দিল। ও না থাকলে হয়তো খেয়ালই করতাম না যে, গ্যালারির মেঝেটা একদম ঢালু। এদিকের মাথা বেশ উঁচু। লম্বালম্বি চেরা অদ্ভুত চেহারার জানালা দিয়ে আলো আসছে। যতই সামনে এগোচ্ছি ততই বাইরের মাটি উঁচু হতে হতে প্রায় ঢেকে ফেলছে জানালাগুলোকে। লণ্ডনের বাড়িগুলোর সামনে যেমন একটা গর্তের মত জায়গা থাকে, শেষমেশ অবশিষ্ট থাকছে ওরকমই একটু গর্ত। ওপরদিকে দিনের আলোর খুব সামান্য একটু আভাস। আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করছিলাম মেশিনগুলো সম্বন্ধে। এত ডুবে গেলাম চিন্তায় যে, আলো যে আস্তে আস্তে কমে আসছে টেরই পাইনি। টের পেলাম উইনার ভয়ার্ত মুখ দেখে। খেয়াল করলাম, গ্যালারিটা শেষ পর্যন্ত ঘন অন্ধকারে গিয়ে মিশেছে। ইতস্তত করে চারদিকে তাকিয়ে দেখি ধুলো এখানে কিছুটা কম। জমাট ধুলোর ওপরটা অসমতল। অন্ধকারের দিকে ছোট ছোট পদচিহ্ন দেখলাম। এগুলোর ফলেই অসমতল হয়েছে ধুলো। ঝট করে মনে পড়ল মরলকদের উপস্থিতির কথা। মনে হলো, যন্ত্রপাতির

তত্ত্ববিচার করতে গিয়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি আমি। বিকেল অনেকটা গড়িয়ে গেছে দেখে টনক নড়ল। এখনও আমার নেই কোন অস্ত্র, নিরাপদ আশ্রয় কিংবা আগুন জ্বালানর কোন সরঞ্জাম। গ্যালারির আঁধারে ঢাকা জায়গা থেকে অদ্ভুত একটা টুপ্ টুপ্ শব্দ শুনতে পেলাম, ঠিক যেরকম অদ্ভুত শব্দ শুনেছিলাম কুয়োয় নেমে।

'উইনার হাত ধরলাম। চকিতে একটা চিন্তা এল মাথায়। ওর হাত ছেড়ে নজর দিলাম একটা মেশিনের দিকে। সিগন্যাল বক্সে যে-ধরনের লিভার থাকে তেমনি একটা লিভার বেরিয়ে আছে মেশিনটার ভেতর থেকে। স্ট্যাণ্ডের ওপর উঠে লিভারটা চেপে ধরে আমার সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে চাপ দিলাম একপাশে। হঠাৎ উইনা গোঙাতে শুরু করল। ওকে একা ছেড়ে আসার জন্যেই হয়তো। লিভারটা কী রকম শক্ত হবে ঠিকঠাক মতই আন্দাজ করেছিলাম। মিনিটখানেকের চেষ্টায় খোলা গেল লিভারটা। উইনার কাছে এসে দাঁড়ালাম লোহার দণ্ডটা হাতে নিয়ে। যেকোন মরলকের খুলি ফাটানর জন্যে এই অস্ত্র যথেষ্ট। দু'একটা মরলককে খুন করে ফেলার নেশা চাপল মাথায়। এই নিজের বংশধরকে খুন করার ব্যাপারটা হয়তো খুব অমানুষিক ঠেকবে আপনাদের কাছে। কিন্তু মরলকদের মধ্যে মানবীয় কোনকিছু খুঁজে পাওয়া এক কথায় অসম্ভব। আমার এই খুনের ইচ্ছেটা যদি দমন করি তাহলে টাইম মেশিন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। গ্যালারির শেষপ্রান্তে গিয়ে টুপ্ টুপ্ শব্দ করা জানোয়ারগুলোকে এখুনি খুন করতে ইচ্ছে হচ্ছে। উইনাকে একা ছেড়ে যেতে হবে, শুধু এ-চিন্তা করে নিজেকে সংযত করলাম।

'একহাতে লিভার, আরেক হাতে উইনাকে ধরে ওই গ্যালারি থেকে বের হয়ে আরেকটা গ্যালারিতে গিয়ে ঢুকলাম। এটা আরও বড়ো। ছিন্নভিন্ন পতাকা ঝুলতে দেখে প্রথমটায় মনে হয় মিলিটারি চ্যাপেলের কথা। বাদামী ছোট ছোট ন্যাকড়ার মত আশপাশ থেকে ঝুলতে দেখে বুঝলাম, এগুলো বই। ধ্বংসের একেবারে শেষে গিয়ে পৌঁছেছে। অনেক, অনেকদিন আগেই ওগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ছাপার শেষ চিহ্নটুকুও গেছে মিলিয়ে। কিন্তু এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে দুমড়ানো মোচড়ানো শক্ত কাগজ। ভাঙা ধাতব কব্জা, যেগুলো দেখে প্রকৃত ঘটনা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। যদি সাহিত্যের লোক হতাম তাহলে হয়তো তাবৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষার অসারতা সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলতাম। ভীষণ ব্যথা পেলাম আমি অজস্র শ্রমের এই করুণ পরিণতি দেখে। সাক্ষী হিসেবে অবশিষ্ট আছে শুধু এই পচা কাগজের বাণ্ডিল। স্বীকার করতে বাধা নেই, সেসময় আমার ঘুরে ফিরে কেবল মনে পড়ছিল "ফিলজফিকাল ট্রানজ্যাকশনস্" আর ফিজিকাল অপটিক্স্-এর ওপর লেখা আমার নিজের সতেরোটি গবেষণামূলক রচনার কথা।

'এরপর চওড়া সিঁড়ি বেয়ে যেখানটায় উপস্থিত হলাম, জায়গাটা বোধহয় একসময় টেকনিকাল কেমিস্ট্রির গ্যালারি ছিল। একটুও আশা জাগল না যে, এখানে কিছু পাওয়া যাবে। একধারে যেখানে ছাদ ধসে গেছে শুধু সেখানেই ভালভাবে কিছু জিনিসপত্র সংরক্ষিত আছে। প্রত্যেকটা ভাঙা বাক্স উৎসাহের সঙ্গে খুঁজে দেখলাম। অবশেষে সম্পূর্ণ এয়ার-টাইট একটা বাক্সে পেলাম এক বাক্স দেশলাই। খুব উৎসাহ নিয়ে পরীক্ষা করলাম দেশলাইগুলো। একদম ঠিক আছে।

স্যাঁতসেঁতে পর্যন্ত হয়নি। উইনার দিকে ঘুরে ওদের নিজের ভাষায় চিৎকার করে বললাম, "নাচো!" ভয়ঙ্কর ওই প্রাণীগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার মত অন্তত একটা অস্ত্র পেয়ে গেছি। সুতরাং পরিত্যক্ত সেই যাদুঘরে, পুরু নরম ধুলোর কার্পেটের ওপর একধরনের জগাখিচুড়ি নাচ নাচলাম উইনার সঙ্গে। আনন্দের আতিশয্যে শিস্ দিয়ে গাইলাম– দি ল্যাণ্ড অব দি লিল। উইনার আনন্দ আর ধরে না। নাচটা হলো ঈষৎ নম্র, কিছুটা ক্যান-ক্যান, কিছুটা স্টেপ ডান্স, কিছুটা স্কার্ট ডান্স (আমার ট্রেইল-কোট নিয়ে যতটুকু পারা যায়), আর কিছুটা সত্যিকারের নাচ। আপনারা জানেন, আমি নতুন কিছু করতে ভালবাসি।

'এখনও ভাবতে অবাক লাগে, অসংখ্য বছর পেরিয়ে দেশলাইয়ের বাক্সটা ভাল ছিল কীভাবে! তবে দেশলাইগুলো পেয়ে আমি স্বস্তি পেয়েছিলাম খুব। দেশলাইয়ের চেয়েও অদ্ভুত আরেকটা জিনিস পেলাম। কর্পূর। বন্ধ একটা জারের ভেতর পেলাম জিনিসটা। প্রথমে ভেবেছিলাম জারটা একেবারে বন্ধ। ভেতরে প্যারাফিন ওয়াক্স আছে ভেবে ভাঙলাম জারটা। গন্ধে বুঝলাম, কর্পূর যে-জিনিস অতি সহজেই উবে যায় সেটা অবশ্যম্ভাবী ক্ষয়ক্রিয়া এড়িয়ে কেমন করে হাজার হাজার শতাব্দী ধরে টিকে আছে তাই ভাবলাম। মনে পড়ল, বেলেমনাইট জীবাশ্মের রঙ দিয়ে করা একটা সীপিয়্যা পেইন্টিং দেখেছিলাম একবার। নিশ্চয় লক্ষ লক্ষ বছর আগে ওই প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে জীবাশ্মে পরিণত হয়েছে। কর্পূরটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ল জিনিসটা দাহ্য। খুবই উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে। চমৎকার একটা মোমবাতির কাজ দেবে। অতএব রাখলাম পকেটে। কোন বিস্ফোরক বা ব্রোঞ্জের দরজা ভাঙার মত কোনকিছু পেলাম না। আমার একমাত্র ভরসা এখন লোহার এই ক্রো-বারটা। তবু উৎফুল্ল মনেই বেরিয়ে এলাম গ্যালারি থেকে।

'দীর্ঘ সেই বিকেলের পুরো বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। অনুসন্ধান করে কী কী পেয়েছিলাম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে করতে গেলে অসাধারণ স্মৃতিশক্তির দরকার। লম্বা একটা গ্যালারি। দু'পাশের মরচে ধরা স্ট্যাণ্ডে বিভিন্নরকম অস্ত্র। ইতস্তত করলাম, ক্রো-বারটাই রাখব, নাকি তার বদলে ছোট একটা কুঠার বা তরবারি নেব? সবগুলো এক সঙ্গে নেয়া যাবে না। ব্রোঞ্জের দরজার জন্যে ক্রো-বারটাই সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হলো। অনেক বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল আছে। বেশির ভাগই শেষ হয়ে গেছে মরচে ধরে। অচেনা ধাতুর তৈরি কিছু অস্ত্র শুধু এখনও মোটামুটি ভাল আছে। তবে গুলি বা বারুদ যা ছিল সব মরচে ধরে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। গ্যালারির একটা পাশ ভেঙে চুরমার হয়ে আছে গোলা-বারুদের কোন বিস্ফোরণেই এমন অবস্থা হয়েছে মনে হয়। আরেকটা জায়গায় সাজানো আছে অনেক দেব দেবীর মূর্তি। পলিনেশিয়া, মেক্সিকো, গ্রীস, ফিনিশীয়– মনে হয় পৃথিবীতে যত দেশ আছে, কোন দেশেরই মূর্তি বাদ নেই। অদম্য একটা আকাঙ্ক্ষা জাগল মনে; সোপস্টোনের তৈরি দক্ষিণ আমেরিকার যে-মূর্তিটা বিশেষভাবে নজর কেড়েছিল, সেটার নাকের ওপর লিখে রাখলাম আমার নাম

'সন্ধ্যা যতই ঘনিয়ে এল, উৎসাহ উবে যেতে লাগল আমার। একের পর এক গ্যালারি পার হলাম। ধুলোভরা, নিস্তব্ধ, বেশির ভাগই বিধ্বস্ত কোনটা ভাল

আছে, কোনটা আবার শুধু মরচে আর পিঙ্গল কয়লার স্তূপ। হঠাৎ এক সময় একটা টিনের খনির মডেলের পাশে আবিষ্কার করলাম নিজেকে। এয়ার-টাইট একটা বাক্সে অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেলাম দুটো ডিনামাইট কারট্রিজ। "ইউরেকা!" চিৎকার করে উঠলাম আমি। খুশিতে ভেঙে ফেললাম বাক্সটা। অকস্মাৎ একটা সন্দেহের উদয় হলো মনে। ইতস্তত করলাম একটু। তারপর পাশের একটা গ্যালারিতে ডিনামাইট লাগালাম। সময় কেটে যেতে লাগল। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট। কোন বিস্ফোরণ হলো না। জীবনে এতটা ভেঙে পড়িনি কোনদিন। বোঝা গেল, ওগুলো ডামি। ভাগ্যিস ডামি ছিল, নইলে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে স্ফিংক্স, ব্রোঞ্জের দরজা, সব উড়িয়ে দিতাম। চিরতরে হারাতে হত টাইম মেশিন।

'প্রাসাদের ভেতরের ছোট একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌছলাম। প্রচুর ঘাস সেখানে। আর আছে তিনটে ফলের গাছ। ফল খেয়ে বিশ্রাম নিলাম আমরা। বেলা আরও গড়িয়ে যেতে তলিয়ে দেখতে শুরু করলাম নিজেদের অবস্থার কথা। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে রাত। নিরাপদ আশ্রয় এখনও খুঁজে পাইনি। তবে খুব একটা ঘাবড়ালাম না। মরলকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার শ্রেষ্ঠ অস্ত্রটি পেয়ে গেছি। দেশলাই! কর্পূর আছে পকেটে, উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থাও করা যাবে। মনে হলো, আগুন জ্বালিয়ে ফাঁকা জায়গাতে রাতটা কাটিয়ে দেয়াই সবচেয়ে ভাল হবে। সকালে টাইম মেশিনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেই চলবে। ওই অভিযানের জন্যে এখনও অস্ত্র বলতে শুধু এই লোহার দণ্ডটা। তবে, ব্রোঞ্জের দরজা এখন আমার কাছে কোন বাধা নয়। দরজাটার ওপর জোর খাটানো চলবে না। জানতে হবে, ওটার ভেতরে কী রহস্য আছে। আমার কখনও মনে হয়নি, ব্রোঞ্জের দরজাগুলো খুব একটা মজবুত। এগুলো ভাঙার জন্যে এই লোহার দণ্ডই যথেষ্ট।'

বারো

অন্ধকারে

'প্রাসাদ থেকে যখন বেরলাম, সূর্য তখনও পুরোপুরি ডুবে যায়নি। আগামীকাল ভোরে শাদা স্ফিংক্সের কাছে পৌছতেই হবে। আর আসার সময় যে-বনের ভেতর ঢুকিনি, সেটাতে ঢুকব অন্ধকার জেঁকে বসার আগেই। মোটকথা, রাতে যতটা এগোন যায় এগোব। তারপর চারপাশে আগুন জ্বেলে ঘুমাব। হাঁটতে হাঁটতে লাকড়ি বা শুকনো ঘাস দেখলেই সেগুলো সংগ্রহ করতে লাগলাম। আমার হাত বোঝাই হয়ে গেল এসব জিনিসে। ফলে যত তাড়াতাড়ি যাব ভেবেছিলাম তা আর হলো না। উইনাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমার চোখও ঘুমে জড়িয়ে আসছে। বনে পৌছবার আগেই রাত নেমে এল। সামনে অন্ধকার দেখে ঝোপঝাড়ে ভরা পাহাড়টার ওপরে থামতে চাইল উইনা। কিন্তু আসন্ন দুর্যোগের এক অদ্ভুত অনুভূতিতে ছেয়ে আছে আমার মন। এগিয়ে চললাম না থেমে। একরাত দু'দিন

আমি ঘুমাইনি। গা জ্বর জ্বর করছে। যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে সমস্ত স্নায়ু। ঘুম আসছে, ঘু- ম। সেইসঙ্গে আসছে মরলকেরা।

'অন্ধকারাচ্ছন্ন ঝোপগুলোর মাঝে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিলাম কী করব ভেবে, হঠাৎ চোখে পড়ল তিনটে অবয়ব। গুটিসুটি মেরে আছে। চারপাশে ছোটখাট ঝোপঝাড় আর লম্বা লম্বা ঘাস। বুঝলাম নিঃশব্দসঞ্চারী হিংস্র জানোয়ারগুলোর হাত থেকে মোটেই নিরাপদ নয় এই জায়গা। বনটা মাইলখানেকের চেয়ে কিছু কম লম্বা। এটার ভেতর দিয়ে ওপারের পাহাড়টায় গেলে মোটামুটি নিরাপদ একটা আশ্রয় পাওয়া যাবে মনে হয়। কর্পূর আর দেশলাই আছে আমার কাছে। আলো জ্বেলে সেই আলোয় বনের ভেতর দিয়ে এগোব, স্থির করলাম। তবে দেশলাই জ্বেলে হাতে আলো নিয়ে এগোতে হলে জ্বালানী কাঠগুলো ফেলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফেলে দিলাম ওগুলো। হঠাৎ মনে হলো, কাঠগুলোতে আগুন ধরিয়ে ভয় পাইয়ে দেয়া যায় পেছনের মরলকদের। সেই ফাঁকে আমরা অনেক এগিয়ে যেতে পারব। পরে বুঝেছিলাম, কতখানি মূর্খের মত করেছি কাজটা।

'মানুষজনহীন, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় আগুন যে কী দুর্লভ একটা বস্তু, তা হয়তো কল্পনাও করতে পারবেন না আপনারা। সূর্যের আলো এখানে এতই কম যে, সর্বোচ্চ তেজ থাকার সময়েও কোনকিছু পোড়াতে পারে না। বজ্রপাতও আগুন ধরাতে পারে কদাচিৎ। গাছপালা মরে গেঁজে ওঠার সময় উত্তাপ সৃষ্টি করলেও আগুন খুব কমই ধরে। আর, পৃথিবীর মানুষ তো আগুন জ্বালানর কৌশল ভুলেই গেছে। আগুনের যে-লেলিহান শিখা কাঠের স্তূপ ঘিরে নাচছে, তা উইনার কাছে যুগপৎ নতুন এবং আশ্চর্যের।

'সে দৌড়ে গেল আগুন নিয়ে খেলতে। বাধা না দিলে বোধহয় সোজা আগুনের মধ্যে ঢুকে যেত। হাত-পা ছোঁড়া সত্ত্বেও ওকে শক্ত করে ধরে এগোলাম বনের পথে। আগুনটা কিছুদূর পর্যন্ত রাস্তা আলোকিত করেছে। ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখি, আগুন লাকড়ির স্তূপ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে আশেপাশের কিছু ঝোপে। আগুনের একটা বাঁকা রেখা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের ঘাসের দিকে। হেসে সামনের অন্ধকারে ঢাকা গাছগুলোর দিকে তাকালাম। নিকষ কালো সে অন্ধকার। কাঁপতে কাঁপতে আমাকে চেপে ধরল উইনা। কিন্তু ততক্ষণে অন্ধকার সয়ে এসেছে আমার চোখে। যতটুকু দেখতে পাচ্ছি তাতে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগার কোন ভয় নেই। নীল আকাশের দু'একটা টুকরো ছাড়া মাথার ওপরটা একেবারেই কালো। আমার দু'হাতই বন্ধ, ফলে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললাম না। বাম হাতে বয়ে নিয়ে চলেছি উইনাকে। ডান হাতে লোহার ক্রো-বার।

'পায়ের চাপে ছোট ছোট ডাল ভাঙছে। মাথার ওপরে বাতাসের ফিসফিস, আমার নিঃশ্বাস আর কানের ভেতর রক্ত চলাচলের দপ্ দপ্ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ পেলাম না কিছুক্ষণ। তারপর পেছনে যেন একটা টুপ্ টুপ্ শব্দ পেলাম। দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে যেতে লাগলাম। আরও পরিষ্কার শোনা গেল টুপ্ টুপ্ শব্দ। পাতালে যেরকম অদ্ভুত শব্দ আর গলার আওয়াজ পেয়েছিলাম, সেরকম শব্দ কানে

আসতে লাগল। মরলকেরা নিশ্চয় সংখ্যায় অনেক। চারপাশ থেকে আমাকে ঘিরে ধরছে তারা। মিনিটখানেকের মধ্যেই কোটে আর হাতে মৃদু টান অনুভব করলাম। ভয়ঙ্কর ভাবে কেঁপে উঠে পাথরের মত স্থির হয়ে গেল উইনা।

'দেশলাই জ্বালানো দরকার। কিন্তু দেশলাই বের করতে গেলে উইনাকে নামাতে হবে। নামিয়ে পকেট হাতড়াচ্ছি, পায়ের কাছে অন্ধকারে একটা হুটোপাটির সঙ্গে মরলকদের অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু কোন সাড়া নেই উইনার। কোটের ওপর, পিঠে, থেকে থেকে গলায় ছোট ছোট নরম হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম। এইসময় খরখর শব্দে জ্বলে উঠল আগুন। জ্বলন্ত কাঠিটা ধরে রাখলাম। দেখলাম, সামনের গাছপালার মধ্যে পালাচ্ছে শাদা পিঠঅলা মরলকেরা। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে এক দলা কর্পূর বের করলাম। কাঠিটা নিবে যাওয়ার আগেই আগুন ধরাতে হবে। চোখ পড়ল উইনার দিকে। আমার পা চেপে ধরে মাটিতে পড়ে আছে মুখ থুবড়ে। নিশ্চল। ধক্ করে উঠল বুকের ভেতরটা। ঝুঁকে পড়ে দেখি, নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কর্পূরে আগুন ছুঁইয়েই ছুড়ে দিলাম। মাটিতে পড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে দপ্ করে জ্বলে উঠল তীব্র আগুন। পালাল মরলকেরা। স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হলো আশপাশের অনেকখানি জায়গা। হাঁটু মুড়ে বসে তুলে নিলাম উইনাকে। বিরাট একটা দলের ঘড় ঘড় শব্দে পেছনের বন আলোড়িত।

'মনে হলো, উইনা অজ্ঞান হয়ে গেছে। সাবধানে ওকে কাঁধে তুলে উঠে দাঁড়িয়ে এগোতে যাব, ভয়ঙ্কর এক বোধ কাঁপিয়ে তুলল অন্তরাত্মা। দেশলাই আর উইনাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অনেকবার এদিক-ওদিক ঘুরেছি। ফলে বেমালুম ভুলে বসে আছি আমার রাস্তাটা কোন্‌দিকে। একটা কথা শুধু মনে হলো যে, সবুজ চিনামাটির প্রাসাদের দিকে আমি পেছন ফিরে আছি। ঠাণ্ডা ঘাম নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। দ্রুত চিন্তাভাবনা করে ঠিক করতে হবে, কী করব। ভাল করে আগুন জ্বেলে ওখানেই থেকে যাব, স্থির করলাম। লতাপাতায় ছাওয়া একটা গাছের গুঁড়ির ওপর উইনাকে নামালাম। এখনও নিশ্চল হয়ে আছে ও। কর্পূরের প্রথম দলাটার আগুন স্তিমিত হয়ে এলে লাকড়ি আর পাতা কুড়াতে লাগলাম। এখানে-সেখানে, আমার চারপাশ ঘিরে অন্ধকারে জ্বল জ্বল করছে মরলকদের চোখ রক্তচুনির মত।

'কাঁপতে কাঁপতে নিবে গেল কর্পূর। একটা কাঠি জ্বাললাম। শাদা দু'টো জানোয়ার এগোচ্ছিল উইনার দিকে। ছুট দিল তারা। একটার চোখ এমনভাবে ধাঁধিয়ে গেল আলোতে, সোজা এসে পড়ল আমার ওপর। প্রাণপণ শক্তিতে ঘুসি মারলাম। মনে হলো, গুঁড়ো হয়ে গেল ওটার হাড়। আতঙ্কে তীব্র চিৎকার ছেড়ে, টলমল করে কয়েক পা এগিয়ে পড়ে গেল ধপাস করে। আরেক দলা কর্পূর জ্বালিয়ে লাকড়ি আর পাতা জড়ো করতে লাগলাম। মাথার ওপরে গাছের কিছু কিছু পাতা ভীষণভাবে শুকিয়ে গেছে। টাইম মেশিন নিয়ে এখানে এসেছি, সপ্তাহখানেক হলো। এর মধ্যে এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। সুতরাং গাছপালার ভেতরে পড়ে থাকা ছোট ডাল জড়ো না করে গাছের ডাল ওপর থেকে টেনে নামাতে লাগলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই কাঁচা কাঠ আর শুকনো লাকড়ির ধোঁয়াভর্তি দম বন্ধ

করা এক ধরনের আগুন জ্বলে উঠল। এবার লোহার ক্রো-বারটার পাশে শুয়ে থাকা উইনার দিকে চোখ ফেরালাম। ওকে জাগানর চেষ্টা করলাম, কিন্তু ফল হলো না। পড়ে থাকল মরার মত। নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিনা তাও ঠিক বুঝতে পারছি না।

'আগুনের ধোঁয়া কাহিল করে ফেলল আমাকে। এছাড়াও বাতাসে ভাসছে কর্পূরের ঝাঁঝাল বাষ্প। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নতুন করে আগুন জ্বালার দরকার নেই। ভীষণ ক্লান্তি লাগছে আমার। বসলাম। আশেপাশে কেবল মর্মর ধ্বনি। বনেরও ঘুম নেমে আসছে নাকি? কি জানি। মনে হলো, একটু ঝিমিয়ে উঠেই আবার চোখ মেললাম। কিন্তু চারপাশে নিকষ কালো অন্ধকার। গায়ের ওপর অনুভব করলাম মরলকদের হাত। ওদের সেঁটে থাকা হাতগুলো ছুঁড়ে ফেলেই পাগলের মত পকেট হাতড়াতে লাগলাম দেশলাইয়ের বাক্সের জন্যে। নেই! আমাকে চেপে ধরল ওরা। মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারলাম, কী ঘটেছে। নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জ্বলতে জ্বলতে একসময় নিবে গেছে আগুন। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে মৃত্যু। সারা বন জুড়ে পোড়া কাঠের গন্ধ। আমার গলা, চুল, হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে চলল ওরা। গাঢ় অন্ধকারে চারপাশ ঘিরে হুড়োহুড়ি করছে নরম দেহের প্রাণীগুলো। এই আতঙ্ক অবর্ণনীয়। দৈত্যাকার কোন মাকড়সার জালে যেন আটকা পড়েছি আমি। একফোঁটা শক্তি নেই শরীরে। পড়ে গেলাম। ছোট ছোট দাঁতের খোঁচা অনুভব করলাম গলায়। গড়িয়ে সরে গেলাম আমি। গড়াতে গিয়ে হাত পড়ল লোহার লিভারটার ওপর। তৎক্ষণাৎ যেন কিছুটা শক্তি ফিরে এল দেহে। ধস্তাধস্তি শুরু করলাম। ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করলাম ইঁদুরের মত মানুষগুলোকে। লোহার বারটা খাটো করে ধরে, ওদের মুখ থাকতে পারে এমন একটা জায়গা অনুমান করে, গায়ের জোরে বসিয়ে দিলাম। থ্যাচ করে প্রচণ্ড আঘাতটা পড়ে ছাতু করে দিল হাড় মাংস। মুক্ত হলাম ওদের কবল থেকে।

'প্রচণ্ড একটা উল্লাস ভর করল আমার ওপর। জানি, মহাবিপদে পড়ে গেছি আমি আর উইনা। তবে সহজে হার স্বীকার করব না। যতটা পারি, উপযুক্ত শিক্ষা দেব মরলকদের। একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দোলাতে লাগলাম লোহার বারটা। চিৎকার করে গোটা বন আলোড়িত করে তুলছে ওরা। কিছুক্ষণ কাটল। আরও বাড়ল ওদের ছোটাছুটি আর চিৎকার। তবে কাছে এল না কেউ। বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে থাকলাম অন্ধকারে। হঠাৎ আশার সঞ্চার হলো। যদি ভয় পেয়ে থাকে মরলকেরা? এরপরই ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। গাঢ় অন্ধকার হালকা হয়ে এল অনেকখানি। একটু একটু দেখতে পেলাম মরলকদের। তিনটে পড়ে আছে আমার পায়ের কাছে ছিন্নভিন্ন অবস্থায়। বিস্মিত হয়ে দেখলাম, অন্যান্যরা স্রোতের মত ছুটে চলেছে তীরবেগে। পিছনে আর সামনের গাছপালার ফাঁক দিয়ে অন্তত সেইরকমই মনে হলো। মরলকদের পিঠের দিকটা আর শাদা লাগছে না। কেমন যেন লালাভ দেখাচ্ছে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপরই গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম আগুনের ফুলকি। মুহূর্তের মধ্যে পোড়া কাঠের গন্ধ, ঘুমপাড়ানী মর্মরধ্বনি যা এখন পরিণত হয়েছে গর্জনে, লাল আভা, মরলকদের পালানো, এসবের অর্থ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে।

'গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে পেছনে তাকালাম। কালো কালো থামের মত

দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম আগুনের লেলিহান শিখা। বন পুড়ছে। আমার প্রথম জ্বালানো আগুন ছুটে আসছে আমারই দিকে। সেই আলোয় এদিক ওদিক তাকালাম উইনার খোঁজে। নেই। পেছনে হিস্ হিস্ আওয়াজ, আর সেইসঙ্গে গাছপালা ভেঙে পড়ার শব্দ। এক এক করে বিস্ফোরিত হচ্ছে গাছগুলো। ধীরস্থিরভাবে ভেবেচিন্তে কিছু করার সময় নেই। লোহার বারটা শক্ত করে ধরে ছুটলাম মরলকেরা যে পথে পালিয়েছে সেই পথে। জীবন আর মৃত্যুর মাঝ দিয়ে ছুটে চলেছি আমি। একবার ডানদিক থেকে তীব্র বেগে এগিয়ে এল আগুন। ছুটলাম বাঁ দিকে। একটা মরলক অন্ধের মত ছুটে এল আমার দিকে, সোজা ঢুকে গেল মুখ ব্যাদান করা আগুনের ভেতর। অবশেষে আমি ছোট একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম।

'তারপর দেখলাম ভবিষ্যত পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাটা। আশেপাশের পুরো এলাকা দিনের মত হয়ে গেছে আগুনের আভায়। ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে একটা টিলা। সমাধিস্তূপও হতে পারে সেটা। চূড়ায় আধপোড়া একটা কাঁটাগাছ। ওপারে বনের আরেকটা দিক। আগুনের শিখা পাক দিয়ে দিয়ে ওপরে উঠছে। জায়গাটার চারপাশেই আসলে ঘিরে ফেলেছে আগুন। টিলাটার ওপর গোটা তিরিশ-চল্লিশেক মরলক। আগুনে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। সেইসঙ্গে অস্থির হয়ে উঠেছে গরমে। পাগলের মত এদিক-সেদিক ছুটতে গিয়ে একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। ওদের চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। আমার দিকে এগোনর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত হানলাম লোহার বার দিয়ে। মারা গেল একটা, পঙ্গু হলো অনেকে। কিন্তু কাঁটাগাছের নিচে, আগুনে লাল হয়ে যাওয়া আকাশের দিকে একটা মরলককে অন্ধের মত হাতড়াতে দেখে আর অন্যগুলোর গোঙানি শুনে আলোতে তাদের নিদারুণ অসহায়তা আর দুর্দশার ব্যাপারটা বুঝলাম। আর আঘাত করলাম না।

'তবু মাঝেমধ্যেই আমার দিকে ছুটে আসতে লাগল মরলকেরা। আতঙ্কে তীব্র বেগে পাশ কাটিয়ে আঘাত এড়াতে লাগলাম। একসময় আগুন কমে এল অনেকটা। ভয় লাগল, এবার হয়তো শয়তানগুলো দেখতে পাবে আমাকে। ওরা দেখতে পাবার আগেই শেষ করে দেব নাকি কয়েকটাকে, একথাও ভাবলাম একবার। কিন্তু আবার ছড়িয়ে পড়ল তীব্র আগুন। আমি শান্ত হলাম। পাহাড়ে মরলকদের কাছে এগিয়ে গেলাম গা বাঁচিয়ে, যদি উইনার কোন খোঁজ পাওয়া যায়। নেই উইনা।

'শেষমেশ টিলার চূড়োয় বসে পড়লাম। দেখলাম, আলোয় অন্ধ অদ্ভুত প্রাণীগুলো হাতড়ে ফিরছে এদিক-সেদিক। অপার্থিব শব্দ করছে। পাকানো ধোঁয়ার স্রোত আকাশে। সেই ভয়াবহ লাল চাঁদোয়ার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট তারা। এত দূরে, যেন অন্য কোন পৃথিবীর। দু'তিনটে মরলক আবার ছুটে এল আমার দিকে। ঘুসি মেরে তাড়ালাম সেগুলোকে। লক্ষ করলাম, গা কাঁপছে আমার।

'প্রায় সারা রাতই মনে হলো, দুঃস্বপ্ন দেখছি। নিজেকে নিজে কামড়ালাম। সংবিৎ ফিরে পাওয়ার তীব্র ইচ্ছায় চিৎকার করে উঠলাম। হাত দিয়ে আঘাত

হানলাম মাটিতে। উঠে দাঁড়ালাম। বসলাম। ঘুরলাম এখানে সেখানে। বসে পড়লাম আবার। তারপর চোখ ঘষতে ঘষতে প্রার্থনা করতে লাগলাম ঈশ্বরের কাছে সংবিৎ ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে। বার তিনেক দেখলাম, অসহ্য যন্ত্রণায় মাথা গুঁজে আগুনের দিকে ছুটে গেল মরলকেরা। অবশেষে, আগুনের মিলিয়ে আসা লাল আভা, কালো ধোঁয়ার স্রোত, শাদা-কালো হয়ে যাওয়া গাছ, সবকিছুর ওপর দিয়ে দেখা গেল দিনের শুভ্র আলো।

'আবার খোঁজ করলাম, উইনার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা। কিছু নেই। স্পষ্ট বোঝা গেল, মরলকের বনের মধ্যে ফেলে এসেছে হতভাগ্য ছোট্ট উইনাকে। যে-দুর্দশার মধ্যে পড়তে হত উইনাকে, তারচেয়ে এটাই অনেক ভাল হয়েছে ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। উইনার কথা চিন্তা করে অসহায় এই জঘন্য প্রাণীগুলোকে নৃশংসভাবে হত্যা করার জন্যে পা বাড়িয়েও আবার নিরস্ত করলাম নিজেকে। টিলাটা বনের বুকে দ্বীপের মত। চুড়ো থেকে ঝাপসা ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল সবুজ চীনামাটির প্রাসাদ। দেখতে পেলাম শাদা স্ফিংক্সকেও। উঠে দাঁড়ালাম। দিনের আলো বেড়েছে আরও। নারকীয় প্রাণীগুলো এখনও এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে আর কাতরাচ্ছে। পায়ে কিছু ঘাস বেঁধে ধূমায়িত ছাই, আগুনে মোচড়ানো কালো সরু উত্তপ্ত ডালপালার মাঝ দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোলাম টাইম মেশিন লুকিয়ে রাখা জায়গাটার দিকে। ভীষণ ক্লান্তি আর খোঁড়া পা নিয়ে আস্তে আস্তে এগোতে হলো। ছোট্ট উইনার ভয়াবহ মৃত্যুতে চরম দুর্দশাগ্রস্ত মনে হলো নিজেকে। ভীষণ দুঃখে ভেতরটা ভেঙে পড়তে চাইছে। এখন, এই চির পরিচিত ঘরে বসে, ঘটনাটাকে সত্যিকারের কিছু হারানর বদলে কোন স্বপ্ন দেখে দুঃখ পাওয়ার মত মনে হচ্ছে। কিন্তু সেই সকালে আমি হয়ে পড়েছিলাম একা, ভীষণ একা। তখন মনে পড়ছিল আমার এই বাসা, এই ফায়ারপ্লেস, আপনাদের কথা। নিদারুণ একটা ব্যথা অনুভব করেছিলাম।

'ধূমায়িত ছাই পার হয়ে, সকালের উজ্জ্বল আকাশের নিচে হাঁটতে হাঁটতে একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম। দেশলাই। প্যান্টের পকেটে খোলা কয়েকটা দেশলাই এখনও আছে। হারানর আগে দেশলাইয়ের বাক্সটা নিশ্চয় ফুটো হয়ে গিয়েছিল কোনভাবে।'

তেরো

শাদা স্ফিংক্সের ফাঁদ

'সকাল আটটা কি ন'টায় বসে পড়লাম সেই হলুদ ধাতব আসনে, এখানে এসে যে-আসনে বসে এই পৃথিবীর সন্ধ্যার দৃশ্যাবলী দেখেছিলাম। সেই সন্ধ্যায় কত হঠকারী ভাবনা-চিন্তাই না করেছিলাম। নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিলাম, যা ভাবছি, ঠিকই ভাবছি। তিক্ত হাসি না হেসে পারলাম না সেদিনের আত্মবিশ্বাসের কথা মনে করে। চোখের সামনে এই সুন্দর দৃশ্য, গাছপালার প্রাচুর্য, অতি চমৎকার প্রাসাদ

আর ধ্বংসস্তূপ, উর্বর দুই তীরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া রুপোর মত চকচকে নদী, সব ঠিক তেমনি আছে। বদলে যায়নি এতটুকুও। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সুন্দর মানুষের জমকালো রোব। যেখান থেকে উইনাকে উদ্ধার করেছিলাম, সেখানে কিছু লোক গোসল করছে। উইনার কথা মনে হতেই খচ্ করে উঠল বুকের মধ্যে। ল্যাণ্ডস্কেপের ওপর ফোঁটা ফোঁটা দাগ পড়লে যেমন খারাপ লাগে, তেমনি খারাপ লাগল পাতালের রাস্তার ওপরের স্তম্ভগুলো চোখে পড়ায়। ওপরের পৃথিবীর মানুষদের সৌন্দর্যের সবকিছুই এখন বুঝতে পারছি। মাঠে চরা গবাদি পশুর মতই চমৎকার দিন কাটে এদের। গবাদি পশুর মতই এদের নেই কোন শত্রু। নেই কোন প্রয়োজন। গবাদি পশুর মতই নিরুপদ্রবে একদিন ঘনিয়ে আসে শেষ সময়।

'ভেবে দুঃখ হলো, আমার যুগের মানুষের কতই না স্বপ্ন, কতই না আশা। ভবিষ্যতের চিন্তায় ব্যগ্র মানুষ পরিষ্কার করেছে আত্মহত্যার রাস্তা। আরাম-আয়েশের দিকে ছুটে গেছে। নিরাপত্তা আর স্থায়িত্ব যার মূলমন্ত্র, সেরকম একটা সুসভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষ অর্জন করেছে তাদের অভীষ্ট। যার শেষ পরিণতি কিনা এই! একসময় জীবন ও সম্পত্তি পেয়েছে পূর্ণ নিরাপত্তা। ধন ও আরাম-আয়েশ নিশ্চিত হয়েছে ধনীদের জন্যে। শ্রমজীবী মানুষ পেয়েছে জীবন ও শ্রমের নিশ্চয়তা। কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকেনি সেই নিখুঁত পৃথিবীতে। থাকেনি কোন বেকার সমস্যা। সমাধানহীন পড়ে থাকেনি একটাও সামাজিক সমস্যা। ফলে এসেছে এই পরম প্রশান্তি।

'প্রাকৃতিক একটা নিয়ম খেয়াল করি না আমরা। বহুমুখী জ্ঞান আসলে পরিবর্তন, বিপদ আর অশান্তির ফসল কোন পশু তার নিজস্ব পরিবেশে যথাযথভাবে বাস করবে, এটাই তো নিয়ম। অভ্যাস আর সহজাত প্রবৃত্তি অর্থহীন না হয়ে উঠলে প্রকৃতি বুদ্ধির কাছে হাত পাতে না। পরিবর্তন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন না থাকলে বুদ্ধি সেখান থেকে বিদায় নিতে বাধ্য। অনেক রকমের প্রয়োজন আর বিপদ দেখা দেয় যেখানে, সেখানকার পশুদেরই শুধুমাত্র কিছুটা বুদ্ধি জন্মায়।

'সুতরাং, ওপরের পৃথিবীর মানুষগুলো এগিয়ে গেছে শক্তিহীন সৌন্দর্যের দিকে। পাতালের ওরা ঝুঁকেছে যান্ত্রিক শিল্পের দিকে। কিন্তু এই নিখুঁত সময়ে, এমনকি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রেও থেকে গেছে একটা খুঁত। স্থায়িত্বের সমস্যা। পাতালের অধিবাসীদের খাবারের ধরন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গেছে পালটে। কয়েক হাজার বছর ধরে দূরে ছিল সবকিছুর মূলে যে-জিনিসটা তা হলো প্রয়োজন। কিন্তু একসময় সেটা আবার ফিরে আসে। প্রয়োজনটা প্রথম দেখা দেয় পাতালে। যত নিখুঁতই হোক পাতালের এই যন্ত্রীরা, বাহ্যিক ভদ্রতায় কমতি ছিল তাদের। সম্ভবত শক্তিটাকেই মূলমন্ত্র হিসেবে নেয় তারা অন্যান্য মাংস যখন আর পেল না ওরা, পুরানো যে অভ্যাস ইতিমধ্যে ত্যাগ করেছিল, আঁকড়ে ধরল আবার সেটাকেই আট লাখ দু'হাজার সাতশ এক খ্রীস্টাব্দ সম্বন্ধে এটাই আমার শেষ ধারণা। মানুষের বিশ্লেষণ শক্তির বাইরে কোন ব্যাখ্যা যদি থাকে এসবের, তাহলে হয়তো আমার এ-ব্যাখ্যা ভুলও হতে পারে। সবকিছু দেখেশুনে আমার যে-ধারণা হয়েছে,

তাই শুধু সরলভাবে বললাম আপনাদের।

'দুঃখ সত্ত্বেও শ্রান্তি, উত্তেজনা আর গত কয়েকদিনের আতঙ্কের পর এই আসনে বসে খুব ভাল লাগছে সামনের শান্ত দৃশ্যাবলী। সূর্যের উষ্ণ আলো ছড়িয়ে আছে। ক্লান্তি আর ঘুমে চোখ বুজে আসছে। অচিরেই তত্ত্ব ছেড়ে ঝিমাতে শুরু করলাম। ঘুম যখন ধরছে, ভাল করেই ঘুমাই। ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়লাম হাত পা ছড়িয়ে। তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে।

'সূর্য ডোবার কিছু আগে ঘুম ভাঙল। মরলকদের পাল্লায় পড়ার কোন ভয় আর নেই পাহাড় থেকে নেমে রওনা দিলাম শাদা স্ফিংক্সের দিকে। একহাতে ক্রো-বার। আরেক হাত পকেটে ঢুকিয়ে দেশলাই নাড়াচাড়া করছি।

'একেবারে অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনার মুখোমুখি হলাম। স্ফিংক্সের পাদানির কাছে পৌঁছে দেখি, ব্রোঞ্জের দরজা হাট করে খোলা। নিচের খাঁজে পড়ে আছে দরজা।

'থমকে দাঁড়ালাম। একটু ইতস্তত করে উঁকি দিলাম ভেতরে।

'ছোট একটা ঘর। ঘরটার এককোণে উঁচু একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে টাইম মেশিন। ছোট্ট লিভারদু'টো পকেটেই আছে। কতভাবেই না পরিকল্পনা করেছি এই জায়গাটা দখলের। অথচ শাদা স্ফিংক্স যেন আত্মসমর্পণ করল অবশেষে। লোহার বারটা ছুঁড়ে ফেললাম দূরে। ওটা ব্যবহার করতে না পেরে আফসোস হচ্ছে।

'ঢুকতে গিয়ে একটা চিন্তা এল মাথায়। মরলকেরা যখন দেখবে, টাইম মেশিন নেই, ওদের মানসিক অবস্থাটা কেমন হবে। কোনমতে হাসি চেপে, ব্রোঞ্জের ফ্রেমটার ভেতর ঢুকে টাইম মেশিনের কাছে এগিয়ে গেলাম। মেশিনটা যত্ন করে তেল দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে দেখে বিস্মিত হলাম খুব। মনে মনে আশঙ্কা ছিল, এটার কার্যপদ্ধতি বুঝতে গিয়ে মরলকেরা হয়তো টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।

'পরীক্ষা করে বুঝলাম, একটুও ক্ষতি হয়নি মেশিনটার। মিছেই আশঙ্কা আমার। হঠাৎ ব্রোঞ্জের পাল্লাদু'টো ওপরদিকে উঠে ঢং করে জুড়ে গেল ফ্রেমের সঙ্গে। চারপাশে অন্ধকার, ফাঁদে পড়ে গেছি। মরলকেরা তাহলে এই ফন্দি এঁটেছে! উল্লাসে মুখ টিপে হাসলাম আমি।

'মৃদু হাসির শব্দ পাচ্ছি। ওরা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। ধীরস্থিরভাবে দেশলাইটা জ্বালাতে চেষ্টা করলাম। লিভারদু'টো কেবল লাগাতে হবে। তারপর অদৃশ্য হয়ে যাব ভূতের মত। কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করিনি আমি। জঘন্য এই দেশলাইগুলো বাক্স ছাড়া জ্বলে না।

'বুঝতেই পারছেন, মুহূর্তেই উবে গেল আমার সমস্ত শ্রান্তি। একটা জানোয়ার ছুঁলো আমাকে। কষে আঘাত করলাম লিভারটা দিয়ে। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে পড়লাম মেশিনের গদিতে। আবার একটা হাত পড়ল গায়ে। আবার। লিভার কেড়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টায় রত মরলকদের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়ে গেল আমার। একই সঙ্গে খেয়াল রাখলাম, কখন লাগে লিভারগুলো। একটা প্রায় কেড়েই নিয়েছিল ওরা। হাত থেকে পিছলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মাথা দিয়ে ঢুঁ মারলাম

অন্ধকারে। লিভারটা পাবার জন্যে হুড়োহুড়ির ভেতর মরলকদের মাথা ঠোকাঠুকির শব্দ পেলাম। বনের ভেতরের লড়াইয়ের তুলনায় এ-লড়াই অনেক ভাল।

'অবশেষে লাগানো হলো লিভার। টেনে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে। হাতগুলো যেন পিছলে সরে গেল। চোখের সামনে থেকে লাফ দিয়ে দূর হয়ে গেছে আঁধার। ফিরে এল আবার সেই ধূসর আলো। ভেতরে সেই প্রবল আলোড়ন, যার কথা আগেই বলেছি।'

চোদ্দ

আরও দূর ভবিষ্যতের দৃশ্য

'টাইম ট্রাভেলিংয়ের সময় অস্বস্তিকর বিভ্রান্তির একটা ভাব আসে, আগেই বলেছি আপনাদের। এবার ঠিকমত বসতে পারিনি গদিতে। কাত হয়ে বসে আছি কোনমতে। দুলছে, কাঁপছে মেশিনটা। কতক্ষণ সেটাকে আঁকড়ে ধরে আছি, জানি না। কেমনভাবে এগোচ্ছি তাও খেয়াল করিনি। ডায়ালে চোখ পড়তে আঁতকে উঠলাম, কোথায় এসেছি! একটা ডায়ালে দিনের হিসেব দেখা যায়। আরেকটা ডায়ালে হাজার দিনের। আরেকটাতে দশ লাখ দিনের। শেষেরটায় একশো কোটি দিনের। ঘটনা হলো, পেছনে না দিয়ে সামনে বাড়িয়েছি লিভার। ডায়ালের দিকে তাকিয়ে দেখি, ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার মত দ্রুত ঘুরে চলেছে হাজার দিন নির্দেশক কাঁটাটি। অর্থাৎ, ভয়ঙ্কর গতিতে এগিয়ে চলেছি আরও ভবিষ্যতের দিকে।

'এগোতে এগোতে সবকিছুর মধ্যে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। স্পন্দিত ধূসর রঙ কালো হয়ে গেল। এখনও আমি অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে এগোচ্ছি। কিন্তু যেভাবে দিন আর রাত পাল্টাচ্ছিল চোখের পলকে, তার তুলনায় গতি কমে গেল অনেক। কমতেই থাকল। খুব হতভম্ব হয়ে গেলাম প্রথমটায়। দিন আর রাত পরিবর্তনের গতি কমেই চলল, কমেই চলল। সূর্যও আকাশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাচ্ছে খুব ধীর গতিতে। শেষে একসময় মনে হলো, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই জায়গায় ঝুলে আছে সূর্য। এরপর স্থায়ী গোধূলির মত একটা আলো ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীতে। কালো হয়ে যাওয়া আকাশের বুক চিরে ধূমকেতু চলে যাচ্ছে থেকে থেকে। শুধুমাত্র সেই সময়েই গোধূলির মত আলোটুকু যাচ্ছে মিলিয়ে। সূর্য নির্দেশকারী আলোর রেখা অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। কারণ, সূর্য এখন আর অস্ত যায় না। উঠে শুধু ঢলে পড়ে পশ্চিমাকাশে। তখন সূর্য হয়ে যায় আরও বড়, আরও লাল। তারার প্রদক্ষিণের গতি কমতে কমতে এখন মনে হয় শুধু আলোর ফুটকি। কোন চিহ্ন নেই চাঁদের একেবারে শেষে, থামার কিছু আগে সূর্য আরও বড়ো, আরও লাল হয়ে স্থির হয়ে রইল দিকচক্রবালের ওপর। বিশাল সূর্য, কিন্তু তাপ নেই এতটুকুও। প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন বলা চলে। থেকে থেকেই মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে

আলো। একসময় কিছুক্ষণের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রায় তখনই ফিরে এল আবার সেই নিষ্প্রভ, লাল আলো। আমাদের সময়ে চাঁদ পৃথিবীর দিকে একপাশ দিয়ে থাকত। এখন পৃথিবীর একটা পাশ স্থির হয়ে আছে সূর্যের দিকে। মাথা নিচু করে পড়তে থাকার সেই বিশ্রী অনুভূতির কথা ভুলিনি এখনও। তাই খুব ধীরে ধীরে কমাতে লাগলাম গতি। আস্তে আস্তে স্থির হয়ে দাঁড়াল হাজারের ডায়ালের কাঁটা। স্রেফ কুয়াশার মত মনে হলো প্রতিদিনের ডায়ালের কাঁটা। গতি কমাতে কমাতে চোখে পড়ল জনশূন্য একটা সমুদ্র সৈকতের অস্পষ্ট রেখা।

'খুব শান্তভাবেই থামল মেশিনটা। চারপাশে তাকালাম। আকাশ আর নীল রঙের নেই। উত্তর-পূর্ব দিকটা কালির মত কালো। ফ্যাকাসে শাদা তারাগুলোকে অন্ধকারের ভেতর উজ্জ্বলই দেখাচ্ছে। মাথার ওপরের আকাশ গাঢ় লাল। তারা নেই একটাও। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে টকটকে উজ্জ্বল লাল আকাশ। ওখানেই দিকচক্রবালের ওপর লাল, স্থির, বিশাল সূর্য। আশেপাশে কুৎসিতদর্শন লালাভ রঙের পাহাড়। পাহাড়গুলোর দক্ষিণ-পুবের খাঁজগুলো ঢেকে আছে গাঢ় সবুজ রঙের গাছপালায়। জীবনের চিহ্ন অন্তত পাওয়া গেল। চিরস্থায়ী গোধূলির তাপে বড় হওয়া সত্ত্বেও বন-শ্যাওলা বা লাইকেনের মতই চমৎকার সবুজ রঙ ওগুলোর।

'ঢালু একটা সৈকতের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে মেশিনটা। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত সাগর পাণ্ডুর আকাশের গায়ে লেপটে থাকা উজ্জ্বল দিকচক্রবালে গিয়ে মিশেছে। বাতাস বইছে না। তীরে আছড়ে পড়া ঢেউ নেই, নেই কোন তরঙ্গ। একটু স্ফীত হয়েই নেমে যাচ্ছে পানি। শাশ্বত সাগর তবু টিকে আছে এখনও! বয়ে চলেছে। এক প্রান্তে, যেখানে মাঝেমধ্যে আছড়ে পড়ছে পানি, তার পাশাপাশি লবণের একটা কঠিন আবরণ বীভৎস আকাশের নিচে গোলাপী রঙ ধারণ করে আছে। মাথার ভেতরে কেমন একটা গুরুভার। নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে। একবার পাহাড়ে উঠতে গিয়ে যে শ্বাসকষ্ট হয়েছিল, ঠিক তেমনি। অর্থাৎ, বাতাস যতটা আস্তে বইছে ভাবছি, আসলে বইছে তার চেয়েও অনেক আস্তে।

'নির্জন সেই ঢালু সমুদ্রতীরের অনেক ওপর দিক থেকে কর্কশ একটা শব্দ ভেসে এল। বিরাট শাদা প্রজাপতির মত কী যেন একটা পাখা ঝাপটাচ্ছে আকাশে। বাঁকা হয়ে উড়তে উড়তে ঘুরে ছোট ছোট কিছু টিলার ওপারে উধাও হয়ে গেল সেটা। এমন এক বিশ্রী শব্দ করল জিনিসটা, শিউরে উঠে আরও শক্ত হয়ে বসলাম মেশিনে। চারদিকে তাকিয়ে খুব কাছেই লালাভ একটা পাহাড় দেখতে পেলাম। কিন্তু ও কি! পাহাড়টা ধীরেধীরে এগিয়ে আসছে আমার দিকে! জিনিসটা আসলে দৈত্যাকার কাঁকড়ার মত একটা প্রাণী। অসংখ্য পাঅলা একটা বিশাল কাঁকড়া বিরাট বিরাট নখর দুলিয়ে, কোচোয়ানের চাবুকের মত দুই শুঙ্গ নেড়ে, ধাতব গোছের মাথার দু'পাশের কুতকুতে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। কল্পনা করতে পারেন দৃশ্যটা? কুঞ্চিত পশ্চাৎভাগে বিশ্রী বিশ্রী পিণ্ড, এখানে-ওখানে ছোপ ছোপ সবুজাভ শক্ত আবরণ ব্রণের মত ফুটে আছে। দোমড়ানো মোচড়ানো মুখে অসংখ্য শুঁয়া কেঁপে কেঁপে কী যেন খুঁজছে।

'গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসা ভূতুড়ে, অশুভ সেই প্রাণীর দিকে তাকিয়ে আছ, হঠাৎ সুড়সুড়ি লাগল মুখে। মাছি ভেবে হাত নেড়ে তাড়াতে গেলাম।

মুহূর্তের মধ্যে আবার ফিরে এল সেটা। সঙ্গে সঙ্গেই কানে বসল আরেকটা। এবার থাবড়া মারতেই সুতোর মত কী যেন একটা হাতে লাগল। সড়াৎ করে হাতের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল জিনিসটা। ভয়ঙ্কর অস্বস্তি নিয়ে ঘুরতেই দেখি, দৈত্যাকার আরেকটা কাঁকড়া ঠিক পেছন দিকে দাঁড়িয়ে। এটারই শুঙ্গ ধরেছিলাম আমি মাছি মনে করে। কুতকুতে অশুভ চোখ ঘুরছে, সারা মুখে লালসাভরা খিদে। সমুদ্র-শৈবালের মত পিছল মাটির আঠালো প্রলেপ মাখা বড়ো বড়ো বিশ্রী থাবা প্রায় এসে পড়েছে গায়ের ওপর। মুহূর্তে হাত চলে গেল লিভারে। একমাস এগিয়ে গেলাম। কিন্তু থামার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, এখনও ওই সৈকতেই আছি আমি। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি প্রাণীগুলোকে। গাঢ় সবুজ লতাপাতার ভেতর দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন আলোয় এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে ডজনখানেক প্রাণী।

'ওই পৃথিবীর ভয়ঙ্কর নির্জনতার অনুভব, বলে বোঝাতে পারব না। লাল পুবাকাশ, কৃষ্ণাভ উত্তরাকাশ, লবণাক্ত নিস্তরঙ্গ সাগর, পাথুরে সৈকতের ওপর কুৎসিত প্রাণীগুলোর ধীর আনাগোনা, বিষাক্ত চেহারার সবুজ লতাপাতা, হালকা বাতাসে শ্বাসকষ্ট– সব মিলিয়ে আতঙ্কজনক এক পরিস্থিতি। এক শতাব্দী সরে গেলাম। আরও বড় দেখাচ্ছে লাল সূর্য। তাপ কমেছে আরও। মুমূর্ষু সাগর, ঠাণ্ডা বাতাস ওই রকমই রয়ে গেছে। লাল পাহাড় আর বুনো সবুজ লতাপাতার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে দৈত্যাকার কাঁকড়ার পাল। পশ্চিমাকাশে দেখলাম, বড় নতুন চাঁদের মত অস্পষ্ট একটা বাঁকা রেখা।

'এই হয়তো থামলাম, আবার তীব্রগতিতে এগিয়ে গেলাম একহাজার বছর, এভাবেই চলল আমার ভ্রমণ। পৃথিবীর রহস্যময় পরিণতি যত দেখলাম, ততই আশ্চর্য হলাম। পশ্চিমাকাশে যতই বড় হচ্ছে সূর্য ততই কমে যাচ্ছে তাপ। মুছে যাচ্ছে পুরানো পৃথিবীর জীবনের চিহ্ন। অবশেষে, তিন কোটি বছর পরে দেখলাম, কালো আকাশের মতই প্রায় হয়ে গেছে সূর্যের আলো। থামলাম আরেকবার। অদৃশ্য হয়েছে কাঁকড়ার দল। সবুজ লতাগুল্ম ছাড়া লাল সৈকতের ওপর আর কোনও চিহ্ন নেই প্রাণের। সৈকতে এখন শাদা শাদা লবণের স্তূপ। তীব্র শীত ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। উত্তর-পূর্ব দিকে কালো আকাশের তারার আলো পড়ে ঝকঝক করছে বরফ। গোলাপী শাদা কিছু টিলার তরঙ্গায়িত চূড়া চোখে পড়ল। সাগরের কিনার ঘেঁষে পাতলা বরফের ঝালর। দূরে ভারি বরফের পিণ্ড। কিন্তু চিরস্থায়ী সূর্যাস্তের আলোয় সাগরের বিস্তীর্ণ লাল জায়গা জুড়ে কোন বরফ নেই।

'চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম জন্তু-জানোয়ারের কোন আভাস পাওয়া যায় কিনা। অজানা কিসের যেন আশঙ্কায় তখনও উঠিনি গদি ছেড়ে। অবশ্য মাটি, আকাশ বা সাগরে কোন কিছুর নড়াচড়ার আভাস পেলাম না। পাহাড়ের গায়ের সবুজ লতাপাতার মধ্যেই জীবনের শেষ চিহ্নটুকু লুকিয়ে আছে। সাগরের মাঝখানে উদয় হয়েছে থ্যাবড়া একটা বালুকাতট। সৈকত থেকে পানি হটে গেছে খানিকটা। কালো কালো কী যেন সব নড়াচড়া করছে মনে হলো বালুকাতটের ওপর। কিন্তু ভাল করে তাকানর সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল জিনিসটা। দৃষ্টি প্রবঞ্চনা করছে আমাকে। কালো বস্তুটা আসলে একটা পাহাড়। আকাশে ফুটে

থাকা অত্যুজ্জ্বল তারাগুলো মিট্‌মিট্‌ করছে না খুব একটা।

'হঠাৎ খেয়াল করলাম, সূর্যের পশ্চিম পাশটার পরিবর্তন হয়েছে। গোল সীমারেখা রূপান্তরিত হয়েছে অবতলে। ক্ষয়ে যাওয়া স্থানটা পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করেছে। আস্তে আস্তে বাড়ছে ক্ষয়। আঁধার হয়ে আসছে চারদিক। বিস্মিত হয়ে মিনিটখানেক তাকিয়ে থেকে বুঝলাম, গ্রহণ শুরু হয়েছে। চাঁদ কিংবা বুধ গ্রহ পার হচ্ছে সূর্যের সামনে দিয়ে। স্বভাবতই প্রথমে ভাবলাম, চাঁদই হবে। কিন্তু ভালভাবে লক্ষ করে বুঝলাম, অন্তর্বর্তী অন্য একটা গ্রহ আসলে অতিক্রম করছে পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে।

'দ্রুত বেড়ে চলল আঁধার। পুব দিক থেকে বইতে লাগল ঠাণ্ডা দমকা বাতাস। শূন্যে ছড়িয়ে থাকা শাদা ফুটকিগুলো সংখ্যায় বাড়ল আরও। সমুদ্রের ধার থেকে ভেসে এল ঢেউয়ের মৃদু ফিসফিস। প্রাণহীন এই শব্দটুকু ছাড়া চারদিক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতার বর্ণনা দেয়া প্রায় অসম্ভব। মানুষের গলা, ভেড়ার ব্যা-ব্যা, পাখীর কিচিরমিচির, পোকার গুন্‌গুন, আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই শব্দগুলোর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই আর। আঁধার ঘন হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আলোর ঘূর্ণায়মান কণার সংখ্যা বাড়তে লাগল, নাচতে শুরু করল সেগুলো চোখের সামনে। আরও ঠাণ্ডা হলো বাতাস। অবশেষে দূর পাহাড়ের শাদা চূড়াগুলো একের পর এক মিশে গেল অন্ধকারে। শোঁ-ও-ও করে গোঙাতে লাগল বাতাস। গ্রহণের কালো ছায়াটা যেন ধেয়ে এল আমার দিকে। ম্লান তারাগুলো শুধু চোখে পড়ছে। আলোহীন একটা অস্পষ্টতায় ছেয়ে গেছে চারদিক। আকাশ ঘোর অন্ধকার।

'নিকষ কালো আঁধারে আতঙ্ক হলো। হাড়-মজ্জা জমিয়ে দেয়া ঠাণ্ডা আর শ্বাসকষ্ট কাহিল করে ফেলল আমাকে। গা কাঁপতে লাগল। ভীষণ একটা বমি বমি ভাব বোধ করলাম, গুলিয়ে উঠল ভেতরটা। লাল, গরম এক ধনুকের মত উঁকি দিল সূর্যের প্রান্ত। সুস্থ হবার আশায় নামলাম মেশিন থেকে। মাথা ঝিমঝিম করছে। যেন লোপ পেয়েছে চিন্তাশক্তি। আবার আপন সময়ে ফিরে যেতে পারব মনে হয় না। অসুস্থ শরীরে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই আবার চোখ পড়ল সেই বালুকাতটে। বুঝলাম, চোখ প্রবঞ্চনা করেনি। জিনিসটা যে নড়ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাগরের রক্তের মত লাল টকটকে পানির বিপরীতে কালো দেখাচ্ছে ওটাকে। গোল, ফুটবলের সমান বা তার চেয়ে বড় একটা আকৃতি। চারপাশে ঝুলছে নরম শুঁড়। মনে হলো, অজ্ঞান হয়ে যাব। সুদূর সেই ভবিষ্যতে, বীভৎস গোধূলির আলোয় অসহায়ের মত পড়ে থাকলে কি ঘটবে, এই ভয়ঙ্কর আতঙ্কজনক চিন্তাই শুধু আমাকে রক্ষা করল অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার হাত থেকে। নিজেকে টেনেহিঁচড়ে কোনমতে উঠে বসলাম গদিতে।'

পনেরো

ফেরা

'ফিরে এলাম আমি। মনে হয় অজ্ঞান হয়ে অনেকক্ষণ মেশিনের ওপর পড়ে ছিলাম। চোখ পিট্ পিট্ করার মত দিনরাতের পালাবদল শুরু হয়ে গেল আবার। সূর্য আবার ধারণ করল তার সোনালি রঙ। আকাশ নীল হয়ে উঠল। স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারলাম। চোখের সামনে অস্থিরভাবে বয়ে চলল পরিচিত বর্ণালী। বন্‌বন্ করে উল্টোদিকে ঘুরে চলেছে ডায়ালের কাঁটা। অবশেষে খুব আবছাভাবে চোখে পড়ল বাড়িঘর। অধঃপতিত মানুষের চিহ্ন। তারা অদৃশ্য হবার পর এল অন্যরা। দশ লাখ দিন নির্দেশক ডায়াল শূন্যে পৌঁছলে গতি কমিয়ে আনলাম। এক এক করে চোখে পড়তে লাগল আমাদের কালের তুচ্ছ স্থাপত্য। হাজার দিন নির্দেশক কাঁটা ফিরে যাচ্ছে তার শুরুর জায়গায়। ক্রমেই কমতে লাগল দিনরাতের ডানা ঝাপটানি। তারপর চারপাশে দেখতে পেলাম আমার পুরানো ল্যাবোরেটরির দেয়াল। খুব ধীরে কমিয়ে আনলাম মেশিনের গতি।

'একটা জিনিস অদ্ভুত ঠেকল আমার। আপনাদের বোধহয় বলেছি, রওনা দেয়ার পরপরই, যখন গতি খুব একটা বাড়েনি, সে-সময় মিসেস ওয়াচেট হেঁটে গিয়েছিল ঘরের ভেতর দিয়ে। আমার মনে হয়েছিল, রকেটের গতিতে চলে গেল সে। যখন ফিরলাম, তখনও দেখলাম ওই একই দৃশ্য। মিসেস ওয়াচেট হেঁটে যাচ্ছে ল্যাবোরেটরির ভেতর দিয়ে। তবে গতবারের তুলনায় ঠিক উল্টো কাণ্ডটা ঘটল। যে-দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখেছিলাম মিসেস ওয়াচেটকে, পেছন দিক হয়ে অবলীলায় যেন ভাসতে ভাসতে সে এবার অদৃশ্য হয়ে গেল সেই দরজার বাইরে। এর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হিলিয়ারকেও দেখেছি বোধ হয়। বিদ্যুৎ ঝলকের মত সে ছুটে চলে গেল।

'পুরোপুরি থামিয়ে ফেললাম মেশিন। পুরানো, চির পরিচিত সেই ল্যাবোরেটরির চারপাশে নজর বুলালাম। যন্ত্রপাতিগুলো যেখানে যেভাবে রেখে গিয়েছিলাম, ঠিক সেভাবেই আছে। টলতে টলতে মেশিন থেকে নেমে বেঞ্চের ওপর বসলাম। বেশ কিছুক্ষণ ধরে থর থর করে ভীষণভাবে কাঁপতে লাগলাম। তারপর ধাতস্থ হলাম একসময়। আমার চারপাশে আবার সেই পুরানো ওয়ার্কশপ। যেমন ছিল, তেমনি আছে। মনে হচ্ছে যেন এখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সম্পূর্ণ ঘটনাটাই হয়তো একটা স্বপ্ন।

'না। আসলে তা নয়। উত্তর-পশ্চিম দিকের যে-দেয়ালের পাশে টাইম মেশিনটাকে দেখেছেন আপনারা, ফিরে এসে ওখানেই আমি থেমেছি। অথচ রওনা দিয়েছিলাম ল্যাবোরেটরির দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে। এই দুই জায়গার মধ্যে যতটুকু দূরত্ব, যে-লনে নেমেছিলাম সেখান থেকে শাদা স্ফিংক্সের বেদীর দূরত্বও ঠিক ততটুকুই। মরলকেরা ওই বেদীর ভেতরেই নিয়ে গিয়েছিল মেশিনটা।

'কিছুক্ষণ আমার মাথা ঠিক ছিল না। ভেবে পাচ্ছিলাম না, কী করব। শেষে উঠে দাঁড়ালাম। প্যাসেজ দিয়ে এগোলাম খোঁড়াতে খোঁড়াতে। পায়ের গোড়ালির ব্যথা তখনও টাটকা রয়েছে। মানসিক যন্ত্রণা, নোংরা শরীর নিয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতি সে সময় আমার। দরজার কাছে টেবিলটার ওপর পেলাম 'স্পল-মল্ গেজেট''। চোখ পড়তে দেখলাম– বৃহস্পতিবার। টাইম পীসের দিকে তাকিয়ে দেখি, প্রায় আটটা বাজে। আপনাদের কথাবার্তা আর প্লেটের ঠুনঠুন্ শব্দ কানে এল। এত অসুস্থ আর দুর্বল অনুভব করছিলাম যে, ইতস্তত করলাম কিছুক্ষণ। তারপর নাকে এল মাংসের চমৎকার গন্ধ। খুললাম দরজা। বাকিটা আপনারা জানেন। মুখ-হাত ধুলাম। খেলাম। তারপর গল্প শোনাতে বসলাম আপনাদের।'

ষোলো

গল্পের পরে

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর টাইম ট্রাভেলার বললেন, 'জানি, আপনাদের খুবই অবিশ্বাস্য লাগছে আমার গল্প। আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, আজ রাতে আবার ফিরে এসেছি আমার চিরপরিচিত ঘরটিতে, গল্প শোনাচ্ছি অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর সব ঘটনার।' ডাক্তারের দিকে তাকালেন তিনি। 'না। আমার এ-গল্প বিশ্বাস করবেন, এমন আশা আমি করি না। মনে করুন, এটা একটা মিথ্যা গল্প। অথবা ভবিষ্যদ্বাণী। ওয়ার্কশপে বসে কল্পনা করেছি এসব। মনে করুন, মানুষের নিয়তি সম্বন্ধে সুদূরপ্রসারী কল্পনা করতে করতে শেষমেশ বানিয়েছি এই অবাস্তব কাহিনী। ধরুন, এই যে আমি দাবি করছি, আমার গল্পটা সত্যি, আপনাদের কৌতূহলের মাত্রা প্রবল করে তোলা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই সে-দাবির। এখন বলুন, গল্পই যদি হয়, কেমন লাগল এই গল্প?'

চিরাচরিত অভ্যাসমত পাইপ দিয়ে তিনি টোকা দিতে লাগলেন ফায়ারপ্লেসের ঝাঁঝরির ওপর। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করল সারা ঘরে। তারপর শুরু হলো চেয়ারের ক্যাঁচ ক্যাঁচ আর কার্পেটের ওপর জুতোর খস খস শব্দ। টাইম ট্রাভেলারের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাকালাম অন্যান্য শ্রোতাদের দিকে। সবাই বসে আছেন অন্ধকারে। সামনে ভাসছে কেবল আলোর কিছু ফুটকি। ডাক্তার যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে গেছেন টাইম ট্রাভেলারের মতই। সম্পাদক কড়া নজরে তাকিয়ে আছেন তাঁর ছয় নম্বর চুরুটের দিকে। ঘড়ি হাতড়াচ্ছেন সাংবাদিক। অন্য সবাই, যতদূর মনে পড়ে, বসে আছেন স্থির হয়ে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দাঁড়ালেন সম্পাদক। টাইম ট্রাভেলারের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ভাবতে দুঃখ হচ্ছে, আপনি গল্প লেখেন না।'

'আপনার বিশ্বাস হয়নি, তাই না?'

'দেখুন–'

'আমার মনে হয় না।'

আমাদের দিকে ফিরলেন টাইম ট্রাভেলার। 'দেশলাই কোথায়?' কাঠি জ্বালিয়ে পাইপ ধরালেন তিনি। ধোঁয়ার ছোট ছোট কুণ্ডলী ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'সত্যি বলতে কি···আমার নিজেরই খুব একটা বিশ্বাস হয় না···কিন্তু তারপরও···'

ছোট টেবিলটার ওপরের সেই বিবর্ণ শাদা ফুলের দিকে চোখ পড়ল তাঁর। নীরবে কি যেন অনুসন্ধান করলেন। তারপর পাইপ ধরা হাতটা উল্টালেন। লক্ষ করলাম, তাকিয়ে আছেন আঙুলের গাঁটের আধা-শুকনো একটা ক্ষতের দিকে।

ডাক্তার উঠে আলোর কাছে গিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করলেন ফুলগুলো। মনোবিজ্ঞানীও ঝুঁকে পড়লেন দেখার জন্যে।

'অনেক রাত হয়েছে। এখন বাড়ি ফিরব কি করে?' বললেন সাংবাদিক।

'স্টেশনে অনেক ছ্যাকড়া গাড়ি পাবেন,' বললেন মনোবিজ্ঞানী।

'ফুলগুলো অদ্ভুত,' বললেন ডাক্তার। 'আমি নিতে পারি?'

একটু ইতস্তত করলেন টাইম ট্রাভেলার। তারপর একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠলেন, 'না। কিছুতেই না।'

'ঠিক করে বলুন তো, এগুলো আপনি কোথায় পেয়েছেন?' বললেন ডাক্তার।

দু'হাতে মাথা চেপে ধরলেন টাইম ট্রাভেলার। তাঁর কথাবার্তার ধরনে মনে হচ্ছে, কী যেন একটা স্থিরভাবে ভাবতে চাইছেন। পারছেন না। 'টাইম ট্রাভেলিংয়ের সময় উইনা আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ফুলগুলো।' ঘরের চারদিকে তাকালেন। 'এই ঘর, আপনারা, প্রতিদিনের হালচাল, এত কিছু কি মনে রাখা যায়! সত্যিই কি কোনদিন আমি টাইম মেশিন কিংবা টাইম মেশিনের মডেল তৈরি করেছিলাম? নাকি সম্পূর্ণটাই শুধু একটা স্বপ্ন? জীবনটাই নাকি আসলে একটা স্বপ্ন– বহুমূল্য এক স্বপ্নমাত্র। তার ওপর আরেকটা বেমানান অদ্ভুত স্বপ্ন সহ্য হবে না আমার। পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয় এসব। কিন্তু কোথা থেকে এল এই স্বপ্ন?···মেশিনটা একবার দেখতেই হবে আমাকে। সত্যি আছে নাকি অমন কোন মেশিন!'

চট্ করে বাতিটা তুলে নিয়ে করিডোর ধরে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। উজ্জ্বল লাল আলো ছড়িয়ে পড়ছে। আমরাও গেলাম পেছন পেছন। বাতির কাঁপা কাঁপা আলোয় বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পিতল, আবলুস কাঠ, হাতির দাঁত আর চকচকে ঈষৎ স্বচ্ছ স্ফটিকের তৈরি মেশিনটা। গরাদে হাত ছুঁইয়ে দেখলাম, বাস্তব– সন্দেহ নেই। হাতির দাঁতের ওপর বাদামী ফোঁটা ফোঁটা দাগ আর আঠালো প্রলেপ। নিচের অংশে কিছু শ্যাওলা আর ঘাস লেগে আছে। ভীষণভাবে বেঁকে গেছে একটা গরাদ।

বেঞ্চের ওপর বাতিটা নামিয়ে, ক্ষতিগ্রস্ত গরাদটার ওপর দিয়ে হাত বুলোতে বুলোতে টাইম ট্রাভেলার বললেন, 'না। সব ঠিকই আছে। আপনাদের যে-গল্পটা বলেছি, সেটা সত্যি। এই ঠাণ্ডার ভেতরে আপনাদের এখানে নিয়ে আসার জন্যে দুঃখিত।' বাতিটা তুলে নিলেন তিনি। একদম নীরবে স্মোকিংরুমে ফিরে এলাম আমরা।

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে হলঘরে এলেন তিনি। কোট গায়ে দিতে সাহায্য করলেন সম্পাদককে। ডাক্তার তাঁর মুখের দিকে চেয়ে একটু ইতস্তত করে,

অতিরিক্ত খাটুনি তাঁকে কাহিল করে ফেলেছে বলতেই, তিনি ফেটে পড়লেন অট্টহাসিতে। এখনও চোখের সামনে ভাসছে, দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে শুভরাত্রি জানাচ্ছেন আমাদের।

সম্পাদক আর আমি একটা ছ্যাকড়া গাড়িতে উঠলাম। তাঁর মতে গল্পটা 'পরিষ্কার মিথ্যা'। আমি কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারিনি। গল্পটা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনই অদ্ভুত। অথচ তাঁর বলার ভঙ্গি কত সংযত আর বিশ্বাসযোগ্য।

'সারা রাতই প্রায় ঘুমাতে পারলাম না। ঠিক করলাম, পরদিন টাইম ট্রাভেলারের সঙ্গে দেখা করব। পরদিন ওখানে গিয়ে শুনলাম, তিনি ল্যাবোরেটরিতে আছেন। আমাকে বাসার সবাই চেনে সুতরাং সোজা ল্যাবোরেটরিতে চলে গেলাম। কিন্তু ল্যাবোরেটরি ফাঁকা। টাইম মেশিনটার দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে থাকার পর হাত বাড়িয়ে লিভারটা ছুঁলাম সঙ্গে সঙ্গে শক্ত চেহারার মেশিনটা বাতাসে আন্দোলিত গাছের ডালের মত কেঁপে উঠল। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম আমি। চট করে মনে পড়ল ছোট বেলার একটা কথা। যা জানি না তা নিয়ে মাথা ঘামাতে নিষেধ করত সবাই। করিডোর ধরে ফিরে এলাম আবার। বাসার ভেতর আসার পথে স্মোকিংরুমে দেখা হলো আমাদের। তাঁর এক হাতে ছোট একটা ক্যামেরা। আরেক হাতে ন্যাপস্যাক। আমাকে দেখে হেসে কনুই এগিয়ে দিলেন। করমর্দনের বদলে কনুইমর্দন। 'ভয়ঙ্কর ব্যস্ত আছি মেশিনটা নিয়ে,' বললেন তিনি।

আমি বললাম, 'সত্যি কি ব্যাপারটা কোনরকম ধোঁকা নয়? আপনি কি সত্যি সত্যি সময়ের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করতে পারেন?'

'হ্যাঁ। সত্যিই পারি আমি।' সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকালেন। একটু থমকে গেলেন। সারা ঘরে ঘুরছে তাঁর দৃষ্টি। 'আমার মাত্র আধঘণ্টা সময় দরকার,' বললেন তিনি। 'আমি জানি, আপনি কেন এসেছেন। আপনাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি। কিছু পত্র-পত্রিকা আছে এখানে। আপনি যদি লাঞ্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করেন, নমুনা-টমুনাসহ আমি প্রমাণ করে দেব টাইম-ট্রাভেলিংয়ের সত্যতা। যদি কিছু মনে না করেন, আমি যাই তাহলে?'

তাঁর কথার সম্পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি না করেই সম্মতি দিলাম। অভিবাদন জানিয়ে করিডোর ধরে চলে গেলেন তিনি। চেয়ারে বসে আমি একটা দৈনিক সংবাদপত্র হাতে নিতেই সশব্দে বন্ধ হলো ল্যাবোরেটরির দরজা। লাঞ্চের আগে কী করতে যাচ্ছেন তিনি? একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আজ দু'টোর সময় প্রকাশক রিচার্ডসনের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে আমার। ঘড়ির দিকে তাকালাম। এখুনি না গেলে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছন যাবে না উঠে করিডোর ধরে ছুটলাম কথাটা টাইম ট্রাভেলারকে জানাতে।

ল্যাবোরেটরির দরজায় হাত রাখতেই কানে এল অর্ধোস্ফুট একটা বিস্ময়ধ্বনি। একটা ক্লিক। তারপর ভারি কোনকিছুর পতনের মত একটা ধপ্ শব্দ। দরজা খুলতেই দমকা বাতাস বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল আমার চারপাশে। মেঝেতে পড়ে কাচ ভাঙার ঝন্ ঝন্ শব্দ এল ভেতর থেকে। টাইম ট্রাভেলার নেই। মুহূর্তের জন্যে যেন দেখলাম, কালো রঙ আর পেতলের ঘূর্ণায়মান স্তূপের

মধ্যে বসে আছে অত্যন্ত অস্পষ্ট, ভূতুড়ে একটা মূর্তি। মূর্তিটা এত স্বচ্ছ, পেছনের বেঞ্চের ওপরের ড্রয়িং শীটগুলো পর্যন্ত একেবারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চোখ ঘষে আবার তাকিয়ে দেখি, উধাও হয়ে গেছে ভূতুড়ে মূর্তিটা।

'চলে গেল টাইম মেশিন। থিতিয়ে আসা ধূলির ঘূর্ণিটা ছাড়া গোটা ল্যাবোরেটরি একদম ফাঁকা। স্পষ্ট বুঝলাম কাচ ভাঙার শব্দের অর্থ। একটা শার্সি গুঁড়ো হয়ে গেছে স্কাইলাইটের।

'যুক্তিবিহীন এক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম আমি। জানি, খুবই অদ্ভুত একটা কিছু ঘটেছে। তবে সেই মুহূর্তে ধরতে পারলাম না কী সেই অদ্ভুত জিনিস। চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে আছি, বাগানের দরজা খুলে হাজির হলো চাকরটা।

দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আস্তে আস্তে ফিরে এল আমার স্বাভাবিক বোধ। 'ওদিক দিয়ে তোমার সাহেবকে যেতে দেখেছ?' জানতে চাইলাম আমি।

'না, স্যার। ওদিক দিয়ে কেউ যাননি। আমি তো ভেবেছি তাঁকে এখানেই পাব।'

আর কোন রহস্য রইল না আমার কাছে। রিচার্ডসন বিরক্ত হবে ভেবেও অপেক্ষা করতে লাগলাম টাইম ট্রাভেলারের জন্যে। নমুনা, ফটো এসব নিয়ে ফিরে এসে আরও কত আশ্চর্য গল্প হয়তো শোনাবেন তিনি।

কিন্তু এখন আমার ভয় হয়, হয়তো সারা জীবন ধরে অপেক্ষা করতে হবে তাঁর জন্যে। তিন বছর আগে উধাও হয়ে গেছেন টাইম ট্রাভেলার। আর, এখন তো সবাই জানে, তিনি আর ফেরেননি।

সতেরো

শেষের কথা

বিস্মিত না হয়ে কারও উপায় নেই। টাইম ট্রাভেলার কি আদৌ আর ফিরবেন? হয়তো অতীতে ফিরে গেছেন তিনি। প্রস্তর যুগের লোমশ, রক্তলোলুপ বর্বরদের মাঝে। অথবা খড়িমাটির পাহাড়ভর্তি সাগরের অতলে। কিংবা জুরাসিক যুগের বিশাল, অদ্ভুত গিরগিটির মত সরীসৃপদের মাঝে। এমনও তো হতে পারে, পাখনাঅলা প্লেসিওসরাসভর্তি প্রাগৈতিহাসিক প্রবালদ্বীপের মাঝে অথবা ট্রাইয়্যাসিক যুগের নিঃসঙ্গ সাগরের পাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। নাকি নিকট ভবিষ্যতে গেছেন তিনি, যেখানে মানুষ এখনও মানুষই রয়ে গেছে, শুধু আমাদের যুগের ক্লান্তিকর, বিশ্রী সব সমস্যার হয়ে গেছে সমাধান। আমার নিজের মতে, সাম্প্রতিক কালের দুর্বল এক্সপেরিমেন্ট, অসম্পূর্ণ তত্ত্ব আর পারস্পরিক মতভেদ দেখে মনে হয় না, মানুষ তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে। আবার বলছি, এটা একেবারেই আমার নিজস্ব মত। টাইম মেশিন আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই

তাঁর সঙ্গে আমাদের এসব আলাপ-আলোচনা হত বলে জানি, মানবজাতির উন্নতির কথা তিনি ভাবতেন বিষণ্ন মনে। ভরসা পেতেন না। ভাবতেন, তথাকথিত দ্রুতবর্ধমান সভ্যতা আসলে মূর্খতার স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। ওই স্তূপ শেষমেশ অনিবার্যভাবে ধসে পড়ে তার সৃষ্টিকর্তারই ধ্বংস ডেকে আনবে একদিন। যদি সত্যি তাই হয়, তাহলে 'অমন হবে না' এই সান্ত্বনায় বুক বেঁধে বেঁচে থাকতে হবে আমাদের। কিন্তু তাঁর গল্পের দু'একটা টুকরো ছাড়া ভবিষ্যৎ এখনও আমার কাছে একেবারেই অজ্ঞাত একটা অতল, অগাধ শূন্যতা মাত্র। সুখের বিষয় এই, আশ্চর্য সেই শাদা ফুল দু'টো এখনও আছে আমার কাছে। কুঞ্চিত ঔজ্জ্বল্যহীন, ভঙ্গুর। রঙ নষ্ট হয়ে পিঙ্গল হয়ে গেছে। কিন্তু ফুল দু'টো আমাকে মনে করিয়ে দেয়, এমনকি চিন্তাশক্তি এবং দৈহিক বল লোপ পাবার পরেও কৃতজ্ঞতাবোধ আর পারস্পরিক সহানুভূতি ঠিকই রয়ে গেছে মানুষের অন্তরে।

***

আলোচনা

[এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, প্রশ্ন, মতামত, নিজের কোনো রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক (jokes) ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের এক পিঠে লিখবেন। পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্টকার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি বা বিষয়বস্তু পুরোনো হয়ে গেছে—দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি দেবেন না। প্রকাশ-যোগ্য চিঠি দিন, ছাপা হবে।

—কা. আ. হোসেন।]

সাইফুর,
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

'মরণ ফাঁদ'-২ এর আলোচনায় "মদ কোনো···জটিলতা বাড়ায়" —শিক্ষণীয় মন্তব্যটির জন্যে জনৈক পাঠক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তো, মদ সংক্রান্ত একটি বিদেশী পত্রিকার জনৈকা কলামিষ্টের এ-রকম একটি বক্তব্যও আমার কাছে অপূর্ব লেগেছিল।

"Those who get drunk to drown their sorrows should be told that sorrow knows how to swim." সত্যিই অপূর্ব, তাই না কাজীদা।

* হ্যাঁ।

মোঃ হারুন-অর-রশিদ (রানা),
মাহিগঞ্জ, রংপুর।

আবার জঙ্গলে ভালই লাগলো। কিন্তু সংকেত (২) এবং সংকেত (৩) বেরুতে দেরী হচ্ছে··কেন?

* সংকেত ২ বেরিয়ে গেছে, ৩ পাবেন জানুয়ারীর শেষ দিকে।

পীযুষ কান্তি সরকার,
ঝাউতলা, কুমিল্লা।

সদ্য প্রকাশিত কিশোর ক্লাসিক-৪ 'কালো তীর' পড়লাম। ভালো লাগলো। ওয়েস্টার্নের পরবর্তী বইয়ের নাম কি? মাসুদ রানা সংকেত-১ অত্যন্ত ভালো লেগেছে। দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় রইলাম।

রকিব হাসানের কোন রহস্য উপন্যাস পাচ্ছি না কেন?

কালো তীরের লেখক নিয়াজ মোরশেদ ও প্রচ্ছদ শিল্পীকে ৮৫'র অজস্র শুভেচ্ছাসহ ধন্যবাদ।

* জানিয়ে দিলাম।

মাহবুবুর রহমান শিশির,
১৪৩২/১-এ, খিলগাঁও, ঢাকা-১৯।

মরণ ফাঁদ বেরিয়েছে বেশ অনেকদিন হলো। কিন্তু এখন পর্যন্ত আলোচনা বিভাগে এর কাহিনী সম্পর্কে কোনো মন্তব্য

দেখতে পেলাম না। বইটা কি এতোই খারাপ ? নাকি এতো ভাল লেগেছে যে ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে ?

আমার বক্তব্য—বইটার উভয় খণ্ডই ছিল প্রচণ্ড টেনশন আর উত্তেজনায় ভরা। পড়ার সময় কতবার যে শরীর শিউরে উঠেছিল কিম্বা কতবার যে দম বন্ধ হয়ে এসেছিল বলতে পারবো না। তবুও কিছু কথা থেকে যায়। বইটার দুটো খণ্ডই ছিল সত্যিকার অর্থে ডিনামাইট। সন্দেহ নেই, ইদানীংকালে প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে উত্তেজনায় ভরা। আর বোধহয় এ-কারণেই যখন দুই খণ্ড শেষ করলাম, মুখোমুখী হলাম দুটো অপ্রিয় সত্যের। এক : কাহিনীর কিছুই মনে নেই। ঘটনাপ্রবাহ সমূহ মগজের ভিতর জগাখিচুড়ী পাকিয়েছে। আর দুই : প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। আসলে পটকা ফাটিয়ে আমরা আনন্দ পাই ঠিকই, কিন্তু সেই একই আনন্দের জন্য আমরা গ্রেনেড ফাটাতে যাই না। প্রচণ্ড উত্তেজনা আর টেনশনের কারণেই কাহিনীর স্বাভাবিক গতিযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। স্যাবটাজেও উত্তেজনা ছিল। তারই ফাঁকে ফাঁকে মাফিয়া সর্দার এবং লুইগীর মধ্যকার শীতল সম্পর্কের বর্ণনা আমাদের মনে ফুর্তি ও বিশ্রাম দুই-ই এনে দিয়েছিল। কিন্তু মরণফাঁদে উত্তেজনাই প্রধান রূপ পেয়েছে। একারণেই বইটা পড়ার সময় যতই সামনের দিকে এগুচ্ছিলাম, টেনশনের চোটে ততোই পিছনের ঘটনাগুলি ভুলছিলাম। সামরিক জীবনের রুক্ষতাই প্রতিটি পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে।

তবুও বলবো, নিয়াজ মোরশেদের প্রচেষ্টা সার্থক। কাহিনী চমৎকার। প্রচ্ছদ মানানসই। লেখকের প্রতি শুভকামনা রইলো।

* আপনার শুভকামনা পৌঁছে দিলাম। সুন্দর আলোচনাটির জন্য ধন্যবাদ।

রম্য,
সাগরপাড়া, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

আমি সেবা প্রকাশনীর ক্ষুদ্র পাঠক। বয়স তের বছর। 'কুয়াশার' মাধ্যমে আপনাদের তথা সেবা প্রকাশনীর সাথে প্রথম পরিচয় ঘটে দেড় বছর আগেই। আমি কিন্তু সেবার ১২৪টা বই পড়েছি।

সদ্য প্রকাশিত 'ক্লাসিক' সিরিজের ৪নং বই 'কালোতীর' পড়লাম। সচ্ছন্দ অনুবাদের জন্য "নিয়াজ ভাই" ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

"রকিব ভাই"কে ধন্যবাদ 'টারজান আবার জঙ্গলে'র জন্য।

"মাহবুব ভাই" কি কিছু লিখছেন? ওহো, তাঁর কি অসুখ ভাল হলো?

"ইউসুফ ফারুকের" লড়াই কই?

* ধন্যবাদ দুটো যথাস্থানে পৌঁছে দিলাম। মাহবুব ভাই ভালো হয়ে গেছেন, আবার লিখতে শুরু করেছেন। 'লড়াই' আসছে শীঘ্রি—ছাপা প্রায় শেষ।

মুনমুন আহমেদ,
শামসুননাহার হল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

অনেক দিন পর 'আবার জঙ্গলে' বইটির আলোচনা বিভাগে জাহেদ-আবদুল্লাহ্ (২৫২ লামাবাজার, সিলেট) সাহেবের লেখা দেখে খুব খুশী হলাম। যাক, বেচারা অনেক দিনে সোহানা বেঁচে

যাবার দুঃখ কাটিয়ে উঠেছেন। সমবেদনা রইল।

* কী পেলেন আপনারা বলুন তো! —কদিন পর পরই একটা করে খোঁচা!

লিটু,
ঝাউতলা, কুমিল্লা।

এডগার রাইজ বারোজের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস "Return of Tarzan" আমি আগেই পড়েছিলাম। সেবা প্রকাশনী থেকে মূল বইটির রূপান্তর "আবার জঙ্গলে" দেখেই কিনলাম, পড়লাম। মূল বইটি থেকে অনূদিত বইটি কিছুটা বাড়িয়ে লেখা হয়েছে। তবে বর্ণনা বেশ গতিশীল, সুন্দর। অনুবাদক রকিব হাসানকে আমার শুভেচ্ছা দেবেন। এডগার রাইজ বারোজের আরো বই আশা করছি।

* পাবেন।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম (শাহীন), সাং ভোগড়া, চান্দনা, ঢাকা।

এইমাত্র 'কালো তীর' শেষ করলাম। এক কথায় অপূর্ব। মোরশেদ ভাইকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। 'কালো তীর' প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৮৪ না হয়ে হবে ডিসেম্বর, ১৯৮৪, তাই না?

* ঠিক ধরেছেন!

কাজল মাহমুদ, মায়া মাহমুদ,
থানাপাড়া, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

হিফজুর রহমান সাহেবের 'অতল প্রলোভন' বইটি কিন্তু এখনো পাচ্ছি না। কারণ কি?

* লেখা শেষ হয়নি এখনও। শুনেছি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আশা করছি শীঘ্রি বের করতে পারবো।

ইকবাল,
ঝাউতলা, কুমিল্লা।

গল্প পাঠাতে চাই। হাতের লেখা ভাল নয়। এটা বাধা কি না জানাবেন।

* বাধা ঠিক নয়। তবে লেখা সুন্দর না হোক, পরিষ্কার হলে সম্পাদনা ও কম্পোজ করতে সুবিধে হয়, ভুলের মাত্রাও কমে যায় অনেকটা।

মোঃ মাহ্‌বুবুল আহ্‌সান (তিতাস),
তেজগাঁও পলিটেকনিক গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল, ঢাকা।

'রবিনসন ক্রুসো' পড়লাম। আমার অনেকদিনের ভ্রান্ত ধারণা পরিষ্কার হয়ে গেল। সেজন্যে লেখককে ধ-ন্য-বা-দ অবশ্যই জানাবেন।

* কী ভ্রান্ত ধারণা ছিল তা কিন্তু বোঝা গেল না। যাই হোক, লেখককে না পেয়ে অনুবাদককেই ধন্যবাদ জানিয়ে দিলাম।

মোঃ সাইদুর রহমান,
১৪৮/১, কাঁঠাল বাগান বাজার, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, ঢাকা-৫

সাত-আট বছর ধরে সেবার বই পড়ছি। কিন্তু কোনদিন আপনাকে লিখি নাই। আসলে আমি এত বই পত্র-পত্রিকা পড়ি যে সময় করে লিখতে পারি না। যেদিন সেবার বই বের হয়, সেদিনই সেটা নিয়ে আসি, অন্য পড়া বাদ। সেবা বই পড়ে ভাবি চিঠি লিখবো। পড়া শেষ হলে মনে থাকে না। এবার না লিখে

পারলাম না, কারণ, কিছুদিন ধরে এমন কয়টি বই বের হয়েছে যেগুলি পড়ে এতই অভিভূত হয়েছি যে, লিখে বলতে পারবো না। সে বইগুলি সপ্ত আতংক, বেন-হুর, রহস্য পত্রিকা, রবিনসন ক্রুসো ও টারজান। রহস্য পত্রিকার আগের দুইটি সংখ্যা আমার আছে, আবার আসাতে ধন্যবাদ। সেবার বই পড়ে শেষ করার পর এমন একটি আবেশ আসে যে, সে মুহূর্তে লেখকের প্রতি সেবার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে। লিখে শুভেচ্ছা বা ধন্যবাদ দিয়েও মনে হয় কিছুই বলা হল না। রহস্য পত্রিকায় তিন গোয়েন্দা, কুয়াশা-৭৫ বের হচ্ছে এই বিজ্ঞাপন দেখে চোখের পানি প্রায় এসে গেছে। কাজীদা, নিয়মিত কুয়াশা লিখলে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। 'টারজান আবার জঙ্গলে' বইটির জন্য লেখককে ধন্যবাদ ও সেবার সমস্ত লেখক, কর্মীকে হাজার ধন্যবাদ।

* আপনাকেও ধন্যবাদ।

মোঃ আয়াতুল ইসলাম,
মৌলভী বাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, জেলা : মৌলভী বাজার।

বেন-হুরের সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য নজরুল ভাইকে আমার ধন্যবাদ দিবেন।

* দিলাম।

নাজমা আলী পুনু,
৪৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-২

কিশোর ক্লাসিক "বেন-হুর" পড়লাম। খুব ভাল লেগেছে। লেখককে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে আরেকটি বই আমি আমার এক বান্ধবীর কাছ থেকে উপহার পেয়ে পড়লাম।

নাম 'হারানো পৃথিবী'। বইটি আমার খুব-খুব-খুব ভাল লেগেছে। আর বইটি শেষ করে আমার মনে হয়েছে, "ইস্ আমি যদি ওদের সাথে ঐ মালভূমিতে যেতে পারতাম!" এই ধরনের বই আমরা আরও উপহার পাবো আশা করি। আচ্ছা, কাজীদা, হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসির' রূপান্তর করলে কেমন হয়? আমি বহুদিন ধরে এই দুইটি বই রূপান্তরের অপেক্ষায় অপেক্ষমান। একটু ভেবে দেখবেন কি?

* একটু বেশি সিরিয়াস হয়ে যায়—তবু ভাবছি।

তারিক,
গোরস্থান রোড, বরিশাল।

এবার নিয়ে জুলভার্নের 'নোঙর ছেঁড়া' তিনবার পড়লাম। ওটা যতই পড়ি ততই পড়তে ইচ্ছে করে। আপনার প্রকাশনী থেকে কি আমরা ওই রকম আরো কিছু কিশোর অভিযান বা অন্য অভিযান সম্বন্ধীয় বই পেতে পারি না? শামসুদ্দিন নওয়াবকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবেন।

* জানিয়ে দিলাম।

শাহাদৎ আলম ঝুনু,
দ্বাদশ—মানবিক, সরকারী আযিযুল হক কলেজ, বগুড়া।

একটু দেরীতে হলেও মরুযাত্রা এবং মানুষ শিকার পড়লাম। দুটি বই-ই চমৎকার। মার্ক, উইল ফ্রেড এবং মারিয়ার মতো ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র উপহার দেওয়ার জন্য কাজি মাহবুব হোসেনকে ধন্যবাদ। চমৎকার প্রচ্ছদের জন্য শা. চৌ.-কেও।

আচ্ছা, কাজীদা, ইদানীং সেবার বই-য়ের প্রচ্ছদ করছেন

বিভিন্ন শিল্পী। কারণটা কি ?

* বৈচিত্র্য।

মোঃ সাব্বির আহমেদ চৌধুরী (রিপন),
২১৯/৭, তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১৫

'কিশোর ক্লাসিক' সিরিজের প্রস্তাবনা এবং বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় MASTERPIECEগুলো পাচ্ছি। শুধুমাত্র ইংরেজী নয়; ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, স্প্যানিশ, গ্রীক, রাশিয়ান প্রভৃতি ভাষার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম ও অবদান এই সিরিজে পাওয়ার আশা রাখি। অনেকদিন থেকেই মনে মনে এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আসছিলাম। এতদিনে তা বাস্তবায়িত হল। যাক, BETTER LATE THAN NEVER. কাজীদা, আমার মনে হয়, 'কিশোর ক্লাসিক' সিরিজে বাংলা ভাষার কোন বই প্রকাশ না করাই ভাল। কারণ, বাংলা আমরা ছোট বড় সবাই কম-বেশি বুঝি। ইচ্ছা হলেই আমরা তা সংগ্রহ করে পড়তে পারি। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও অনেকে ইংরেজী কিংবা অন্যান্য ভাষার বই পড়তে পারে না, কিংবা বোঝে না। তাই, ঐ সমস্ত ভাষার বইগুলো সরল বাংলায় সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করলে অনেকেই পড়তে পারবেন এবং খুশি হবেন। বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে এই যে আমাদের উপহার দিচ্ছেন, তাতে আপনি এবং সংশ্লিষ্ট সবাই নিঃসন্দেহে ধন্যবাদের পাত্র হবেন।

* উৎসাহিত করার জন্য ধন্যবাদ।

বের হয়েছে
কাজী আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত তৃতীয় সংখ্যা

আগাগোড়া অফসেটে ছাপা অসংখ্য ছবিসমৃদ্ধ
চাররঙা মনোলোভা প্রচ্ছদে মোড়া
আপনার মনের মতো পত্রিকা।

শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়ের
একটি সম্পূর্ণ রহস্যোপন্যাস মরণখেলার খেলোয়াড়
আবু কায়সার ও আবুল হাশেমের
দুটি চমৎকার গল্প
এবং ছয়জনের লেখা
৬টি বিশেষ আকর্ষণীয় ফিচার ছাড়াও
এতে রয়েছে নিয়মিত বিভাগ : রোমহর্ষক, খোলা চিঠি
রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক হত্যা, মনের দর্পণ
মানসিক সমস্যা, ভূতপ্রেত, এ-মাসের ভাগ্য, বিস্ময়
আইন আলোচনা ইত্যাদি

এবং
মুজাফ্‌ফর হোসেন মানিকের
একটি বিশেষ সচিত্র প্রতিবেদন
নৌকায় খুন।

আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি অর্ডার যোগে ৫০'০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা বা শুধু অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেল্‌স ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

কুয়াশা-৭৫

রচনা—কাজী আনোয়ার হোসেন

বহুদিন প্রতীক্ষার পর আবার এলো কুয়াশা। ঝাঁপিয়ে পড়লো শহীদ, কামাল এমন এক শত্রুর বিরুদ্ধে যাকে কাবু করতে হলে কুয়াশার সাহায্য একান্তই দরকার।

এইচ জি ওয়েলস এর অবিস্মরণীয় বিজ্ঞান কল্পকাহিনী

টাইম মেশিন

রূপান্তরঃ খসরু চৌধুরী

অত্যাশ্চর্য এক বাহন- টাইম মেশিন। তাতে চেপে টাইম ট্রাভেলার গিয়ে হাজির হয়েছেন আট লক্ষ দুই হাজার সাতশো এক সালের পৃথিবীতে। অবাক বিস্ময়ে দেখছেন সভ্যতাগর্বিত মানবজাতির অনিবার্য রোমহর্ষক পরিণতি।

কিন্তু কোথায় অদৃশ্য হল টাইম মেশিন? শত সহস্র যুগের ওপারে অতিদূর ভবিষ্যতে তাহলে কি রয়ে যাবেন টাইম ট্রাভেলার?

নিদারুণ উৎকণ্ঠার সেই মুহূর্তে আশ্চর্য এক বন্ধনে জড়িয়ে ফেলেছে তাকে শিশুর মত কোমল, উচ্ছল, মমতাময়ী উইনা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০